ইসলাম সন্ত্রাসকে নিন্দা করে

মূল রচনা : হারুন ইয়াহিয়া

অনুবাদ: জাবীন হামিদ
ই-মেল : jabin.hamid@gmail.com

লেখক পরিচিতি:

ইয়াহূদী, খৃস্টান ও মুসলমানদের শ্রদ্ধেয় দুই নবী হযরত হারুন (আ:) ও হযরত ইয়াহিয়া (আ:) -- যারা ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন , তাঁদের পুণ্য স্মৃতির সম্মানে তুরস্কের লেখক আদনান ওকতার নিজের ছদ্মনাম “ হারুন ইয়াহিয়া ” বেছে নিয়েছেন।

তাঁর বইয়ের প্রচ্ছদে হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর ব্যবহৃত সিলমোহর প্রতীকী অর্থ বহন করে। পবিত্র কূরআন যে শেষ আসমানী কিতাব ও হযরত মুহাম্মাদ (দ:) যে সব নবী ও রাসূলদের সিল বা শেষ রাসুল , তা এই সিলমোহরের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে।

লেখক ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে যেন জিহাদে লিপ্ত। কূরআন ও হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর জীবন আদর্শের কথা তিনি তাঁর বইগুলিতে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি পার্থিব স্বার্থে ভোগবাদী মানুষের ধর্মহীনতা , বিবর্তনবাদীদের মিথ্যা প্রচার ও ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতার অশুভ পরিণাম নিয়ে মুসলমানদের সতর্ক করেছেন।

বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা :

বিভিন্ন জাতিগত বিদ্বেষ ও ভুল বোঝাবোঝির মুলে রয়েছে মিথ্যা এক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই সুস্পষ্ট বর্বরতা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। কেননা, বর্তমান যুগের বিভিন্ন ভুল মতবাদ এই মিথ্যার প্রতিষ্ঠিত । এসবের মিথ্যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হলো ডারউইনের তথাকথিত বিবর্তন মতবাদ। অনেকেই ভাবেন এটি কেবল জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।কিন্তু আসলে বিবর্তনবাদ এর চেয়েও অনেক বেশী কিছু। এটি শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের মতবাদ নয় , এটি অনেক দর্শনতত্ত্বের ভিত যা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে প্রভাবিত করেছে ও করছে।

হারুন ইয়াহিয়ার বই এই মিথ্যা তত্ত্বগুলির অসারতা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে ও মহান স্রষ্টার সর্বশেষ কিতাব কূরআন শরীফের আদর্শ জীবনে বাস্তবায়ন করতে তাগিদ দেয়। মুসলমান ও অমুসলমান সবারই এই বইয়ের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

অনুবাদের ব্যপারে কোন পরামর্শ থাকলে ই-মেলে জানাতে অনুরোধ করছি। যাজাক আল্লাহু খায়রান (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন)।

জাবীন হামিদ
ই-মেল : jabin.hamid@gmail.com

সূচী --

ভূমিকা:

ইসলামের নীতিকথা : শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস

পবিত্র কুরআনের আলোকে যুদ্ধ:

যারা ধর্মের নামে সন্ত্রাস করে , সেই সব সন্ত্রাসীদের প্রকৃত চেহারা :

আসমানী কিতাবের মানুষদের প্রতি কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গী:

ইসলাম মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও ঐক্য এনেছিল:

সন্ত্রাসের প্রকৃত ভিত্তি বা কারণ : ডারউইনিজম ও জড়বাদ তত্ত্ব (ভোগবাদিতা বা মেটিরিয়েলিজম)

একটি রক্তাক্ত জুটি : ডারউইনিজম ও কমিউনিজম:

বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা :
সমাপ্তি: পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিমদের কাছে সুপারিশসমূহ:

ভূমিকা:

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে, দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসা দেবেন

(পবিত্র কূরআন , সুরা মারইয়াম , ১৯: ৯৬)

২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকার দুইটি প্রধান শহরে সন্ত্রাসী হামলায় হাজারো নিরপরাধ মানুষ খুন ও জখম হয় । মুসলমান হিসাবে ৯/১১ এর সন্ত্রাসী ঘটনার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করছি। নিহতদের পরিবার, আহত মানুষ -- এক কথায় পুরো আমেরিকাবাসীকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে হামলার প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসের মুল কারণ আসলে কী, সেই বিষয়টি পুরো পৃথিবীতে আলোচনার মুলে চলে আসে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে পুরো বিশ্ববাসীকে জানানো হয় যে , ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক নেই। সত্যিকার ইসলাম শান্তি ও সহনশীলতার ধর্ম।

বিশ্বের অনেক বড় বড় নেতা, রাষ্ট্রপ্রধান, জনপ্রিয় গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ইসলাম সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে এবং বিভিন্ন মানুষ ও জাতির মধ্যে একতা স্থাপনের কথা বলে। ইসলামের মুল আদর্শকে পুরো পাশ্চাত্য বিশ্ব যেন এসময় বুঝে উঠতে পারে এবং কুরআনে আল্লাহ'র আদেশ সম্পর্কে পশ্চিমারা ভালভাবে অবহিত হয় যে, সন্ত্রাস ও ইসলাম পাশাপাশি চলতে পারে না। স্রষ্টার কাছ থেকে আসা পবিত্র কোন ধর্মই সন্ত্রাস করার অনুমতি দেয় না।

এই বইতে বলা হয়েছে, আমরা যে সন্ত্রাসের নিন্দা করি , সেই সন্ত্রাসের উৎস অবশ্যই পবিত্র কোন ধর্ম নয় এবং ইসলামে সন্ত্রাসের কোন জায়গা নেই। ইসলামের উৎস পবিত্র কুরআনে ও প্রকৃত মুসলিম শাসকদের ইতিহাসে বিশেষ করে হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় অনেক আগেই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে । এই বইতে পবিত্র কুরআনের আলোকে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন কাহিনীর উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে , ইসলাম সন্ত্রাসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং বিশ্বের মানুষের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার কথা বলে।

পুরো পৃথিবীতেই নানা অজুহাতে বহু দল বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাস করেছে। শত শত বছর ধরে এমনটি ঘটছে। কখনো কোন কমিউনিস্ট দল , কখনো ফ্যাসিস্ট দল , কখনো চরমপন্থী , বিচ্ছিন্নতাবাদী দল এসবের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেছে।

আমেরিকা প্রায়ই বর্ণবাদী ও সন্ত্রাসী দলগুলির আক্রমণের শিকার হয় আর ইউরোপীয় দেশগুলি বিভিন্ন সন্ত্রাসী দলের তীব্র আক্রমণের প্রধান ঘটনাস্থলে পরিণত হয় ।

গ্রীসের একটি সন্ত্রাসী দল যার নাম ১৭ নভেম্বর , জার্মানীর আর এ এফ (রেড আর্মি ফ্যাকশন) এবং নিও নাৎসী , স্পেনের ইটিএ, ইটালীর রেড ব্রিগেডসহ অনেক দলই পৃথিবীতে রয়েছে যারা নিরীহ, অসহায় মানুষকে মেরে তাঁদের দাবীর প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সন্ত্রাসের প্রকৃতিও বদলায়। উন্নত প্রযুক্তির কারণে সন্ত্রাসের শক্তি ও প্রভাব অনেক গুণ বেড়ে যায়। যেমন, গণমাধ্যম তথা ইন্টারনেট সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সুযোগ ও প্রভাব তুলনামুলকভাবে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

পশ্চিমা সংগঠনগুলির পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে থেকে উদ্ভুত অনেক সন্ত্রাসী দল রয়েছে। এই সব দল বিশ্বের প্রায় সব জায়গায় নানা ধরণের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সব সন্ত্রাসী দলগুলি , মুসলমান বা ইয়াহূদী নামধারী হয়। কিন্তু , আসলে স্রষ্টার কাছ থেকে আসা পবিত্র ধর্মগুলি এসব সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না।

সত্যি কথা হলো এই যে, কোন সন্ত্রাসী যদিও মুসলমান পরিচয়ধারী হয় , তার সন্ত্রাসী কাজকে কখনোই " ইসলামী সন্ত্রাস " বলা যাবে না। যেমনটি বলা যাবে না খৃস্টান বা ইয়াহূদী সন্ত্রাস যদিও সন্ত্রাসীরা সেই ধর্মের পরিচয়ধারী হয়। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখাবো , পবিত্র ধর্মের নামে অসহায় , নিরপরাধ মানুষকে খুন করাকে কখনোই মেনে নেয়া যায় না।

আমাদের মনে রাখা দরকার , নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটনে যারা খুন হয়েছে , সেই (খৃস্টান রা) ভালবাসতো হযরত ঈসা (আ:) কে , ইয়াহূদীরা শ্রদ্ধা করতো হযরত মুসা (আ:) কে এবং মুসলমানরা ভালবাসতো হযরত মুহাম্মাদ (দ:) কে। নিরীহ মানুষদের খুন করা হলো বড় পাপ । যদি আল্লাহ মাফ না করেন , তাহলে এই পাপের শাস্তি দোযখের আগুন। কোন ধার্মিক ব্যক্তি যে কিনা আল্লাহকে ভয় করে , তার পক্ষে এই পাপ কাজ করা সম্ভব নয়।

ধর্মকে আঘাত করার ইচছা থেকেই একমাত্র এই ধরনের আগ্রাসী আক্রমণ চালানো সম্ভব–

যারা এই ধরনের সন্ত্রাসী আক্রমণ চালায় , তারা ধর্মকে মানুষের চোখে শয়তানী বা অশুভ শক্তি হিসাবে উপস্থাপন করে। মানুষকে তারা ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর যারা ধর্ম পালন করে তাদের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করে। ধর্মের মুখোশ পরে আমেরিকায় বা যে কোন

মানুষের উপর যে সব আঘাত আনা হয়েছে, তা আসলে ধর্মের উপরেই প্রচন্ড আঘাত হেনেছে।

ধর্ম আদেশ করে ভালবাসতে , ক্ষমা করতে , শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। সন্ত্রাস হলো ধর্মের ঠিক বিপরীত। সন্ত্রাস হলো নিষ্ঠুর , ক্ষমাহীন আর দাবী করে অসহায়ের রক্ত আর যন্ত্রণা। এসবের ভিত্তিতে সন্ত্রাসের মুল উৎস খুজতে হবে অবিশ্বাসে , ধর্মহীনতায় ------কখনোই ধর্মে নয়। মানুষের প্রতিক্রিয়াশীলতা , কমিউনিষ্ট ভাবধারা, বর্ণবাদী আচরণ বা জীবনের প্রতি ভোগবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীকে আমরা সম্ভাব্য হুমকি হিসাবে ধরে নিতে পারি।

কে গুলি ছুড়ছে , তার নাম বা পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে যদি চোখের পাতা একবারও না কাঁপিয়ে অসহায় মানুষকে মারতে পারে , তাহলে সে অবিশ্বাসী ---কখনোই ধর্মবিশ্বাসী নয়। সে হলো খুনী যার মনে আল্লাহ’র ভয় নেই। এই সন্ত্রাসীর মুল লক্ষ্য হলো রক্ত ঝরানো আর ক্ষতি করা।

এজন্য ইসলামী সন্ত্রাস বা মুসলিম সন্ত্রাসী ধারণাটি হলো পুরোপুরি ভুল। এটা ইসলামের আদর্শের বিরোধী। ইসলামে সন্ত্রাস তথা নিরপরাধীকে খুন করা একটা বড় পাপ। মুসলমানদের দায়িত্ব হলো এই ধরণের পাপকে প্রতিরোধ করা আর পৃথিবীতে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামের নীতিকথা : শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস

যারা ইসলামের নামে সন্ত্রাস করে, তারা আসলে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে। এজন্য তারা যা করছে তা অন্যায় হচ্ছে। এজন্য এই সব সন্ত্রাসীদের নিজ নিজ ধর্মের প্রতিনিধি মনে করা হবে মারাত্মক ভুল। একটি ধর্মকে বুঝতে হলে তার মুল উৎস থেকে জানতে হবে।

ইসলামের পবিত্র উৎস হলো কুরআন শরীফ। এই পবিত্র কিতাবের ধারনাগুলির ভিত্তি হলো নৈতিকতা , ভালবাসা, সমবেদনা , বিনয় , ত্যাগ , ধৈর্য ও শান্তি। যে মুসলিম এই

সব নৈতিক উপদেশগুলি মেনে চলে , স্বভাবতই সে হয় সব থেকে ভদ্র, বিনয়ী , চিন্তায় সাবধানী , শালীন , ন্যায় বিচারক , বিশ্বাসী । মানুষ তাঁকে আপন ভাবতে পারে। সেই হলো মুসলমান যে ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও বেঁচে থাকার আনন্দ নিজের চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে , সবার সাথে মিলেমিশে চলে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম:

বৃহত্তর অর্থে বলা যায় , রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বেসামরিক মানুষদের উপর আক্রমণ চালানো হলো সন্ত্রাস । অন্যভাবে বলা যায় , যে কোন নিরপরাধ মানুষকে আক্রমণ করাই হলো সন্ত্রাস। সন্ত্রাসীদের চোখে হামলার শিকার ঐ মানুষদের একমাত্র অপরাধ হলো, তাঁরা অন্য মতের প্রতিনিধি। সন্ত্রাস হলো অসহায় মানুষের রক্ত ঝরানো , যা কোন যুক্তিতেই সমর্থন করা যায় না। হিটলার ও স্ট্যালিন যে নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

কুরআন মানুষের কাছে এসেছে সত্যের পথ প্রদর্শক হিসাবে । এই আসমানী কিতাবে আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন উন্নত নৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করতে। আরবী যে শব্দ থেকে ইসলাম এসেছে তার অর্থ শান্তি। ইসলাম এসেছে শান্তির ইচছা নিয়ে যাতে আল্লাহ’র অনন্ত ক্ষমা ও সান্ত্বনার বার্তা এই পৃথিবীতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ সবাইকে ইসলামী মুল্যবোধের প্রতি আহবান করেন যাতে পৃথিবীর সবাই সহনশীলতা, ক্ষমা, শান্তি উপভোগ করতে পারে । সুরা বাকারার ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, হে মুমিনগণ ; তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।এই আয়াতে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে, ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করলে তবেই নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এর মানে, কুরআনের মুল্যবোধের মধ্যে আমাদের বাস করতে হবে। কুরআনের এই মুল্যবোধের জন্য একজন মুসলমানকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি দয়া দেখাতে হয়। তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে হয়; অভাবী ও নিরপরাধকে রক্ষা আর অনিষ্টের বিস্তারকে প্রতিহত করতে হয়।অনিষ্ট বা অপকার হলো তাই যা নিরাপত্তা,আরাম, শান্তিকে নষ্ট করে। আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি পাপ ও

নীতিহীনতাকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ এই আচরণের কথা বলেছেন এভাবেঃ ‘আর যখন সে ফিরে যায় তখন সে চেষ্টা করে যাতে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ বিনাশ করতে পারে। আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না ’(সুরা বাকারা; ২:২০৫) ।অকারণে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা অনিষ্টের একটি বড় উদাহরণ। আল্লাহ ইয়াহূদীদের কাছে যে আদেশ পাঠিয়েছিলেন, সেটাই আবার জানিয়ে দিলেন পবিত্র কুরআনেঃ ‘.... কেউ কাউকে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা দুনিয়ায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো, আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করলো, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো। তাদের কাছে তো এসেছিল আমার অনেক রাসূল স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে। কিন্তু এরপরও তাদের অনেকেই দুনিয়ায় সীমা লংঘনকারীই রয়ে গেল (সুরা মায়িদা; ৫: ৩২)।

এই আয়াতে স্পষ্ট বলা দেয়া হয়েছে, যে অকারণে কাউকে হত্যা করে নি বা দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে নি, এমন একজন মাত্র নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা মানেই হলো যেন দুনিয়ার সব মানুষকে মেরে ফেলা। এই যখন বিধান, তখন সহজেই বোঝা যায়, বেপরোয়া হামলা ও নির্বিচারে হত্যাকান্ড যা সন্ত্রাসীদের কাছে আত্মঘাতি হামলা নামে জনপ্রিয় , তা কত বড় পাপ। কেননা, এতে অসংখ্য নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায় ।

আল্লাহ্ বলেছেন, এই ধরণের নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড ও বড় পাপের শাস্তি তিনি কিভাবে পাপীদেরকে পরকালে দেবেন---- ‘‘ অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এরকম লোকদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব (সুরা শূরা; ৪২: ৪২)।

এই সব কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে যে, নিরপরাধ মানুষদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সন্ত্রাস পুরোপুরি ইসলামের বিপরীত ; আর এটা কখনোই হতে পারে না যে কোন প্রকৃত মুসলিম এধরণের অপরাধ করবে। বরং বলা যায় যে, মুসলমানদের কর্তব্য হলো , এই ধরণের পাপীদের থামানো এবং পৃথিবীর বুক

থেকে এই ধরণের অন্যায়কে নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীর মানুষের কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা পৌঁছে দেয়া। ইসলাম কখনোই সন্ত্রাসের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে পারে না। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে বলা যায়, ইসলাম হলো সন্ত্রাস প্রতিরোধের পথ ও উপায়।

আল্লাহ পাপকে নিন্দা করে একে দন্ডনীয় অপরাধ বলেছেন :

আল্লাহ মানুষকে আদেশ করেছেন কোন অন্যায় না করতে ––– যেমন: অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, হত্যা ও রক্ত ঝরানো এসব হলো নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেছেন, যে এই আদেশ পালনে ব্যর্থ হয়, সে যেন শয়তানের পথ অনুসরণ করে । সে ব্যক্তি পাপের পথকে বেছে নিয়েছে যা স্পষ্টতই অন্যায় বলে কুরআনে বলা হয়েছে। এ ব্যপারে কুরআনের অসংখ্য আয়াতের মধ্যে কয়েকটি হলো:

‘‘আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় শপথ করার পর তা ভেঙ্গে ফেলে এবং যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদেরই জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং তাদেরই জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম ’’(সুরা রা’দ; ১৩: ২৫)।

........তোমরা আল্লাহ’র দেয়া জীবিকা থেকে পানাহার কর আর পৃথিবীতে দাঙ্গা–হাঙ্গামা করো না (সুরা বাকারা; ২: ৬০)।

‘‘পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকো ভয় ও আশা নিয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ’র রহমত নেককারদের নিকটবতী (সুরা আ’রাফ : ৭: ৫৬)।

যারা মনে করছে পাপাচার, বিপ্লব ,অত্যাচার আর নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে সাফল্য লাভ করা যাবে, তারা আসলে মারাত্মক ভুল করছে। আল্লাহ সব ধরণের অন্যায়কে নিষিদ্ধ করেছেন যার মধ্যে অবশ্যই সন্ত্রাস আর সংঘর্ষ অন্তর্ভূক্ত । যারা এই ধরণের কাজ করে আল্লাহ তাদের নিন্দা করে এক আয়াতে বলেছেন, “ আল্লাহ তো অশান্তি সৃষ্টিকারীদের

কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হতে দেন না” (সুরা ইউনুস; ১০: ৮১)। ’বর্তমান সময়ে সন্ত্রাস, গণহত্যা , বেপরোয়া হত্যাকান্ড পুরো পৃথিবী জুড়েই হচ্ছে। নিরপরাধ মানুষদের নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হচ্ছে আর দেশে দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে কৃত্রিমভাবে ঘৃণার জন্ম দিয়ে রক্তের স্রোতে তাদেরকে ডুবানো হচ্ছে। এই ধরণের তীব্র ঘৃণা সৃষ্টির কারণ ও পটভুমি এক একটি দেশের ঐতিহ্য , সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামো ভেদে আলাদা আলাদা হয়ে থাকে।

ধর্মীয় নীতিকথা আমাদের শেখায় ভালবাসা, শ্রদ্ধা আর সহনশীলতা ; কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এই নৈতিকতা আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় চেতনার অভাবে এমন এক গোষ্ঠীর জন্ম হচ্ছে যারা আল্লাহকে ভয় পায় না এবং বিশ্বাস করে যে পরকালে তাদের কোন কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। যেহেতু তারা এটাই বিশ্বাস করে যে ,‘ আমাকে কারো কাছেই কোন কাজের জন্য দায়ী হতে হবে না, ’ তাই তারা খুব সহজেই অন্যের জন্য কোন দু:খবোধ ছাড়াই, নৈতিকতা আর ভাল–মন্দ বিচার না করেই কাজ করতে পারে।আল্লাহ ও ধর্মের নাম ব্যবহার করে ভন্ড ব্যক্তিরা নিজেদের অস্তিত্ব আমাদের সামনে প্রকাশ করে; কিন্তু আসলে তারা সে সব পাপাচারে লিপ্ত থাকে যেগুলিকে আল্লাহ নিন্দা করেছেন। এই ধরনের ঘটনার প্রতি নির্দেশ করে পবিত্র কুরআনের ২৭ নং সুরায় নয়জন মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা নবী (দ:) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল ; এবং সেটা তারা করেছিল আল্লাহ’র নামে শপথ করে করবে বলেই। ‘‘ আর সেই জনপদে এমন নয়জন ব্যক্তি ছিল, যারা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াত এবং একটুও শান্তি স্থাপন করতো না। তারা বললো, তোমরা আল্লাহ’র নামে কসম করো যে, আমরা রাতের বেলা নবীকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অবশ্যই হত্যা করবো; তারপর তাঁর অভিভাবককে অবশ্যই বলে দেব যে, আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকান্ড দেখি নি, আর আমরা তো সত্যবাদী। তারা এক গোপন ষড়যন্ত্র করলো এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা তা টেরও পেল না ’’ (সুরা নামল্ ২৭: ৪৮–৫০) ।

কুরআনের আয়াতের বর্ণণায় বোঝা যায় , বাস্তবে মানুষ অনেক কিছুই আল্লাহ’র নামে করে এমন কি আল্লাহ’র নামে শপথও করে তারা। অন্যভাবে বলা যায়, তারা নিজেদেরকে খুব ধার্মিক হিসাবে দেখানোর জন্যই আল্লাহ’র নাম ব্যবহার করে। কিন্তু তাই বলে এটা বলা যাবে না যে , তারা যা করছে তার সাথে ইসলামের আদর্শের মিল রয়েছে। বরং বলা যায়, তারা যা করছে তা আল্লাহ’র অপছন্দের কাজ এবং ধর্মীয় নৈতিকতার বিরোধী। তারা কি করছে সেই সত্য তাদের কাজের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে।যদি তাদের কাজ এমন হয় যা পবিত্র কুরআনের

আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ বিপর্যয় সৃষ্টি আর শান্তি স্থাপন না করা’ , তাহলে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি এই ধরনের মানুষ কখনোই প্রকৃত ধার্মিক নয়। ধর্মের কল্যাণের জন্য কিছু করা কখনোই এদের উদ্দেশ্য নয়।একজন আল্লাহ ভীরু ব্যক্তি যে কিনা ইসলামের নৈতিকতাকে বুঝতে পেরেছে সে কখনোই পাপ ও সন্ত্রাসকে সমর্থন করতে পারে না। এ ধরনের কোন কাজে অংশ নেয়া তার পক্ষে অসম্ভব । ইসলামেই রয়েছে সন্ত্রাসের সত্যিকার সমাধান।কুরআনের উন্নত নীতিমালাকে যখন বুঝিয়ে বলা হয় , তখন যে কোন মানুষের পক্ষেই সত্যিকারের ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সমর্থকদের ও সন্ত্রাসী দলগুলিকে মেলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য হলো ঘৃণা , যুদ্ধ আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। অন্যদিকে , আল্লাহ পাপকে নিষিদ্ধ করেছেন। ‘আর যখন সে ফিরে যায় , তখন সে চেষ্টা করে যাতে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ বিনাশ করতে পারে। আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে বলা হয়: আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার অহংকার তাকে পাপে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং দোযখই তার জন্য যথাযোগ্য স্থান। নিশ্চয়ই তা হলো নিকৃষ্ট আবাস (সুরা বাকারা, ২: ২০৫-২০৬)। এই আয়াতে প্রকাশ পাচ্ছে, কোন আল্লাহভীরু ব্যক্তির পক্ষে সামান্য কোন কাজও যা মানবতার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, সে ব্যপারে নির্বিকার থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। যে ব্যক্তি স্রষ্টায় ও পরকালে বিশ্বাসী নয়, তার পক্ষে সহজেই সব পাপ কাজ করা সম্ভব। কেননা, সে মনে করে কারো কাছেই তার কোন জবাবদিহিতা নেই।বর্তমান পৃথিবীকে সন্ত্রাসের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য প্রথমেই যা করতে হবে, তা হলো সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে বিপথগামী ধর্মহীন বিশ্বাস যা ধর্মের নামে প্রচার করা হয় , সে সবকে দূর করা আর মানুষকে কুরআনের সত্যিকার নীতিকথা শেখানো ও আল্লাহকে ভয় করা ।

বিশ্বাসীদের দায়িত্ব:

ধর্ম মানুষকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দান করে ; যার ফলে মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় স্বার্থহীনতা, ভ্রাতৃত্ববোধ , বন্ধুত্ব , সততা ও সেবা করার মনোভাবের অনুগত হওয়া। কোন ঘটনায় সরাসরি প্রভাবিত না হওয়া পর্যন্ত যারা কোন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত । এ ধরণের মানুষেরা সারা জীবন ধরে শুধুমাত্র নিজের আত্মাকেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে ; মানবতার জন্য যা হুমকি --- সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ বেখবর থাকে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সে সব ব্যক্তির নীতিকে প্রশংসা করেছেন যারা নিজেদের চারপাশে যা আছে তার কল্যাণে সংগ্রাম করে। তারা নিজেদের আশেপাশে কী ঘটছে সে নিয়ে সচেতন এবং এরা মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকে।

যারা অন্যের উপকারে কিছুই করতে পারে না এবং যারা সবসময় কল্যাণের জন্য কাজ করে, তাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াতে একটি রূপকের বর্ণনা করা হয়েছে : ‘‘আল্লাহ আরও উদাহরণ বর্ণনা করছেন দুই ব্যক্তির : তাদের মধ্যে একজন বোবা, কোন কাজই করতে পারে না , তাই সে তার মনিবের গলগ্রহ ; মনিব তাকে যেখানেই পাঠায় , সে ভাল কিছুই করে আসতে পারে না; সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে যে ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং সরল পথে রয়েছে ? ’’(সুরা নাহল , ১৬: ৭৬)

আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে , ‘ সরল পথে তারাই আছে ’ যারা তাঁদের ধর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ; স্রষ্টার প্রতি যারা ভীত , স্রষ্টার আদেশের প্রতি মনোযোগী ; উচ্চ , আধ্যাত্মিক মুল্যবোধের অধিকারী এবং যারা মানবতার সেবা করতে অত্যন্ত আগ্রহী।

সাধারণভাবে বলা যায়, কিছু মানুষ আছে যারা মানবতার কল্যাণে কাজ করে আর মানুষের জন্য নিজেদের সাথে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। এই কারণে কুরআনের নীতিমালার আলোকে জীবন যাপন করা ও সত্য ধর্ম সম্পর্কে জানা মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরী । কেননা, কুরআন হলো স্রষ্টার কাছ থেকে আসা মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত বাণী । যারা এই ধরনের উন্নত মুল্যবোধের অধিকারী হয়ে জীবন

কাটায়, কুরআনে তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : “ তারা এমন লোক, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং নেক কাজের পরিণাম তো আল্লাহরই হাতে ” (সুরা হজ্জ, ২২: ৪১)

আল্লাহ আমাদের ভাল কাজের আদেশ দিয়েছেন:

সেই হলো মুসলমান যে আল্লাহ’র আদেশের প্রতি অনুগত; কুরআনের আদেশের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান হয়ে জীবন কাটায়; শান্তি ও ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে যা পৃথিবীকে আরো সুন্দর করে তোলে ও উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। তাঁর লক্ষ্য হলো মানুষকে সুন্দর আর কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়া।

কুরআন বলে, ...এবং তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না (সুরা কাসাস, ২৮: ৭৭)।

কেউ যদি আল্লাহ’র সন্তুষ্টি অর্জনের ও বেহেশত লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শকে গ্রহণ করে, তাহলে সে অবশ্যই কল্যাণের জন্য উদ্যোগী হবে। আর যতদিন সে এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে ততদিন আল্লাহ’র কাছে অনুমোদিত নীতিমালাকেই গ্রহণ করতে হবে। এই নীতিমালার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে সহানুভূতি , দয়া, ন্যায়-বিচার , সততা , ক্ষমা , মানবতা ধৈর্য ও ত্যাগে । যে বিশ্বাসী সে মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করে। ভাল কাজ করার চেষ্টা করে এবং নিজের চারপাশে কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়।

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন : “ আমি অযথা সৃষ্টি করি নি আসমান ও পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে তা। আর অবশ্যই কিয়ামত আসবে। তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর ”(সুরা হিজর, ১৫:৮৫)’।

‘...... আর ভাল ব্যবহার করো পিতা-মাতার সাথে , আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতীমদের সাথে, মিসকীনদের সাথে, নিকট-প্রতিবেশী ও দূর-প্রতিবেশীদের সাথে, সঙ্গী-সাথী ও পথচারীর সাথে এবং তোমাদের অধিকারে থাকা দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক , অহংকারী ব্যক্তিকে (সুরা নিসা, ৪: ৩৬)।

‘ ..... তোমরা একে অন্যকে নেক কাজে এবং আত্মসংযমে সাহায্য করবে, কিন্তু পাপ কাজ ও সীমা লংঘনের ব্যপারে একে অন্যকে সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর । (সুরা মায়িদা, ৫:২)

এই সব আয়াতগুলিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ চান যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁরা অবশ্যই মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করবে ; একে অন্যকে কল্যাণের পথে সহযোগিতা করবে আর পাপ কাজকে এড়িয়ে চলবে। পবিত্র কুরআনের সুরা আন’আমের ১৬০ নং আয়াতে আল্লাহ কথা দিয়েছেন, ‘ যে একটি নেক কাজ করবে সে তার দশ গুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে তাকে শুধু সেই কাজের পরিমাণই প্রতিফল দেয়া হবে। আর তাদের উপর জুলুম করা হবে না। (৬: ১৬০)।

আল্লাহ তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেছেন, ‘‘ তিনি মানুষের মনের গোপন কথা জানেন ; এবং তিনি মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন, ‘‘ সব শয়তানী কাজকে এড়িয়ে চলতে ’’ । সেজন্য যে মুসলমান (আল্লাহ’র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণকারী) , সে অবশ্যই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করবে।

একজন মুসলিম তাঁর চারপাশে কী ঘটছে , সে ব্যপারে নির্বিকার থাকতে পারে না। একই সাথে তাঁর এই ধরণের মনোভাবও থাকতে পারে না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কোন ক্ষতি হচ্ছে না , ততক্ষণ কোন কিছুতেই কিছু যায় আসে না। এর কারণ, সে নিজেকে আল্লাহ’র কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাই সে হচ্ছে আল্লাহ’র প্রতিনিধি; কল্যাণের পথের নিবেদিতপ্রাণ দূত।

এই কারণে সে নিষ্ঠুরতা আর সন্ত্রাসের চেহারা দেখে চুপ করে থাকতে পারে না। যে সন্ত্রাস নিরপরাধ মানুষকে মেরে ফেলে , মুসলমানরা হলো সেই সন্ত্রাসের সবচেয়ে বড় শত্রু। ইসলাম সব ধরণের সন্ত্রাসী কাজের বিরোধী ; শুরু থেকেই তাই ইসলাম সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে । ইসলাম মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবী জানায় আর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম মানুষকে আদেশ করে মতভেদ, যুদ্ধ আর পাপ থেকে দুরে থাকতে।

আল্লাহ ন্যায় আচরণের আদেশ করেছেন:

আল্লাহ কুরআনে মানুষকে আদেশ করেছেন ন্যায় আচরণ করতে ; মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য না করতে এবং মানুষের অধিকার রক্ষা করতে। একজন মুসলমান কোন অবস্থাতেই অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের পক্ষ অবলম্বন করবে এবং অসহায়কে সাহায্য করবে।

কোন মতভেদ দুর করতে যখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় , তখন একটি ঘটনার সব দিক বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে; যে কোন ধরণের পক্ষপাত বা বিদ্বেষকে দুরে রেখে বস্ত্তনিষ্ঠতা, অকপটতা , ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও দয়ার পরিচয় দিয়ে দু’পক্ষেরই অধিকার রক্ষা করতে হবে---এটাই ন্যায় বিচারের দাবী।যদি কেউ সংযতভাবে একটি ঘটনার মূল্যায়ন না করেন এবং আবেগতাড়িত হন , তাহলে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হবেন এবং পূর্ব ধারণার বশবর্তী থাকবেন। ন্যায়বিচারককে ব্যক্তিগত আবেগ ও মতামতকে একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে। তাঁকে সব পক্ষের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে । বিচার করার সময় যে কোন পরিস্থিতিতে যে সঠিক তার পক্ষ অবলম্বন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই সত্যের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া যাবে না।

একজন মানুষকে কুরআনের মুল্যবোধকে এমনভাবে আত্মস্থ করতে হবে ; যাতে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে তিনি অন্য পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেন এবং ন্যায়-বিচার করতে পারেন। এতে তাঁর নিজের স্বার্থের ক্ষতিও যদি হয় তো হোক।

আল্লাহ সুরা মায়িদায় আদেশ করেছেন , ‘ .....আর যদি বিচার ফয়সালাই করো তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে বিচার করবে (৫:৪২)। ’ সুরা নিসায় আল্লাহ বিশ্বাসীদের হুকুম করেছেন ন্যায় বিচার করতে যদিও তা নিজেদের বিরুদ্ধে যায়-- ‘ ওহে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ’র সাক্ষী হিসাবে যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; অতএব ন্যায়বিচার করতে গিয়ে তোমরা কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রেখ , নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কর তার পরিপূর্ণ খবর রাখেন। (সুরা নিসা, ৪:১৩৫)।

কুরআনে আল্লাহ ন্যায়- বিচারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বিশ্বাসীদের আল্লাহ বলেছেন কিভাবে বিভিন্ন ঘটনা বা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে এবং তখনো ন্যায়-নীতি কিভাবে বজায় রাখতে হবে।

এই ধরনের নীতি-নির্দেশনা বিশ্বাসীদের জন্য পরম স্বস্তির ব্যাপার এবং আল্লাহ’র তরফ এটা একটা বড় অনুগ্রহ। এজন্য যারা বিশ্বাসী তারা নিরপেক্ষভাবে সুবিচার করবে যাতে আল্লাহ’র অনুমোদন লাভ করা যায় ; একই সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বাস করা যায়।
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে যে ন্যায়-বিচারের আদেশ দিয়েছেন তা সবার জন্য প্রযোজ্য। কোন নির্দিষ্ট ভাষার, জাতির বা দলের জন্য আলাদা কোন বিশেষ সুবিধা নেই। কুরআনের ন্যায় বিচার দেশ , কাল বা মানুষ ভেদে পক্ষপাতিত্ব করে না। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই অসংখ্য মানুষ বর্ণবাদ বা জাতিগত সমস্যায় অবিচার ও নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছে।আল্লাহ কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন, বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির সৃষ্টির পেছনে উদ্দেশ্য হলো যেন মানুষ ‘ একে অন্যকে জানতে পারে। ’ বিভিন্ন জাতির সব মানুষেরাই আল্লাহ’র বান্দা। তাঁদের উচিত একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করা। সেজন্য বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য ও তাদের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে জানতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষ সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার উদ্দেশ্য হলো নানা সংস্কৃতির মিলনমেলা ঘটানো ----মতভেদ আর যুদ্ধ নয়।সৃষ্টির এই বৈচিত্র্য হলো আল্লাহ’র অকৃপণ দান। কেউ কারো থেকে লম্বা হলে বা কারো গায়ের রং ফর্সা হলে সেটা তাকে অন্যের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে না। আবার চেহারা নিয়ে লজ্জিত হওয়ারও কিছু নেই । আল্লাহ পরিকল্পনা করেই সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য দিয়েছেন; যার ফলে ব্যক্তিভেদে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হয়। কিন্তু আল্লাহ’র কাছে এই বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন গুরুত্ব নেই। বিশ্বাসী মাত্রই জানেন, অন্য মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হতে হলে আল্লাহ ভীরুতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে।

এই বিষয়টি কুরআনের ৪৯ নং সুরায় বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে: “হে মানুষ ; আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে , যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহ’র কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি , যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধর্মভীরু । নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জানেন , সবকিছুর খবর রাখেন” (সুরা হুজুরাত, ৪৯:১৩)।

আল্লাহ সেই ন্যায়–বিচারের প্রশংসা করেছেন যা সমতা, ধৈর্য এবং শান্তিপূর্ণভাবে করা হয়। বিচারপ্রার্থী কারো সাথেই কোন বৈষম্য করা হয় না।

কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাব বিশ্বাসীকে ন্যায়বিচার করা থেকে বিরত রাখে না:–

রাগ ও ঘৃণা মানুষকে সঠিক চিন্তা ও আচরণ করতে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাঁধা দেয়। তাই এই দুইটি আবেগ অশুভ কাজের অন্যতম প্রধান কারণ। রাগ ও বিদ্বেষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ মানুষের সাথে অবিচার করে ; যার ফলে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয় শত্রুতা।

তারা মানুষকে এমন কাজের জন্য দোষী করে যে অপরাধ আসলে তারা কখনোই করে নি; কখনো অন্য মানুষের বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যদিও জানে যে তারা নিরপরাধ। এসব শত্রুতার কারণে মানুষকে অসহ্য যন্ত্রণা ও নিপীড়ন সহ্য করতে হয়।
যাদের সাথে সু–সম্পর্ক নেই, তাদের পক্ষে সত্য সাক্ষ্য দেয়াটা কিছু মানুষ এড়িয়ে যায়। যদিও তারা জানে যে এরা নির্দোষ। এমন কি, তাদের নির্দোষ হওয়ার প্রমাণও তারা গোপন রাখে। সবচেয়ে বড় কথা, নিরপরাধ মানুষের দু:খ ও অবিচারের শিকার হওয়া দেখে এরা আনন্দিত হয়।তাদের সবচেয়ে বড় ভয় এটাই যে, এই নিরপরাধরা যে নির্দোষ এটা যেন প্রমাণিত না হয় ; এরা চায় , নিরপরাধ যাতে ন্যায় বিচার না পায়।এসব কারণে , এই অশুভ শক্তির সমাজে একে অন্যকে বিশ্বাস করাটা খুব কঠিন। মানুষ ভয় পায় যে , তারা যে কোন সময়ে বিপদে পড়তে পারে। পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ধীরে ধীরে তারা বিভিন্ন মানবিক গুণাবলী যেমন ধৈর্য , সহানুভূতি , ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতার মনোভাব হারিয়ে ফেলে এবং একে অন্যকে ঘৃণা করতে শুরু করে।

যাই হোক, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মনোভাব যেমনই থাকুক , একজন আল্লাহভীরু মানুষের সিদ্ধান্তকে তা প্রভাবিত

করবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর কাছে যতই অনৈতিক বা শত্রুভাবাপন্ন মানসিকতার মনে হোক্ না কেন, বিশ্বাসী ব্যক্তি বিচার করার সময় এই সব পূর্ব ধারণাগুলিকে একপাশে সরিয়ে রাখবে। এরপর সে ন্যায়সঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত নেবে ও যা নায্য তা সুপারিশ করবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি বিরূপ মনোভাব তার বিচার- বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধকে প্রভাবিত করবে না।

তাঁর বিবেক তাকে সবসময় সমর্থন জানাবে আল্লাহ’র আদেশ ও উপদেশ মেনে চলতে। কখনোই ভাল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা যাবে না। কেননা, আল্লাহ কূরআনে এই আদেশ দিয়েছেন । সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে : ‘‘ ওহে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা অবিচল থাকবে আল্লাহ’র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যপারে ; এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের কখনও প্ররোচিত না করে ন্যায়বিচার বর্জন করতে। ন্যায়বিচার করবে। ন্যায়বিচার করাই তাকওয়ার নিকটতম। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যা তোমরা করো।’’ (সূরা মায়িদা, ৫:৮) ।এই আয়াত অনুযায়ী , ন্যায়বিচার করতে মানুষ তখনই রাজী থাকে যখন তাঁর মনে আল্লাহ’র ভয় কাজ করে। একজন ধর্মবিশ্বাসী মানুষ জানে যে, সে তখনই আল্লাহ’র সন্তুষ্টি অর্জন করবে যখন সে সবার সাথে ন্যায় আচরণ করবে। যারা এই ধরণের মানুষদের ন্যায়সঙ্গত আচরণ লক্ষ্য করবে তারা তখন তাকে বিশ্বাস করবে। তাদের উপস্থিতিতে নিশ্চিত বোধ করবে এবং বিশ্বাস করে তাঁদের উপর যে কোন দায়িত্ব দিতে পারবে। এই ধরনের মানুষদের এমনকি তাঁদের শত্রুরাও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এমনও হতে পারে, কিছু মানুষ এই ধরণের ধর্মভীরু মানুষের উত্তম মন-মানসিকতা ও সদ্ব্যবহার দেখে স্রষ্টাকে বিশ্বাস করতে শুরু করবে।

ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে:

ইসলাম ধর্ম স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা আর মুক্ত জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। মানুষকে মানসিক চাপ, ঝগড়া , অপবাদ , এমন কি নেতিবাচক চিন্তা থেকেও রক্ষা করতে তাই ইসলাম কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছে।

ইসলাম সন্ত্রাস ও সব ধরনের সংঘর্ষপূর্ণ কাজের বিরোধী । ইসলাম মানুষের উপর জোর করে কোন আদর্শ বা ধারণাকে চাপিয়ে দিতে নিষেধ করে; কারো উপর সামান্যতম জোর খাটানো যাবে না। ‘ দীনের ব্যপারে কোন জোর–জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ভুল পথ থেকে.... (সুরা বাকারা, ২: ২৫৬)।

‘ অতএব উপদেশ দিতে থাকো , তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি ওদের নিয়ন্ত্রক নও ’(সুরা গাশিয়া , ৮৮: ২১–২২)।

মানুষকে জোর করে কোন ধর্মে বিশ্বাস করানোটা ইসলামের মুল চেতনা ও নির্যাসের বিরোধী। কেননা, ইসলামে বলা হয়েছে, সত্যিকারের বিশ্বাস আসে স্বাধীন চিন্তা ও ভাল–মন্দ বিচার করার ক্ষমতা থেকে।

অবশ্যই মুসলমানরা উপদেশ দিতে পারবে এবং অন্যকে সমর্থন জোগাবে ইসলামের নীতিমালার ব্যপারে। বিশ্বাসী মাত্রেরই দায়িত্ব হলো সুন্দরভাবে কুরআনের বাণী জানানো। তাঁরা ধর্মের সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করবে কুরআনের আয়াতের আলোকে ––––‘তুমি আহবান করো মানুষকে তোমার রবের পথের দিকে জ্ঞান ও ভাল উপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে বিতর্ক করো...... (সুরা নাহল , ১৬: ১২৫)। তারা কুরআনের এই আয়াতকেও বিবেচনায় রাখবে যে , ‘......তাঁদের ভাল পথে আনার বাধ্যবাধকতা তোমার নয়; বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে ভাল পথে পরিচালিত করেন (সুরা বাকারা, ২: ২৭২)।

তারা কখনোই কোন রকমের জোর–জবরদস্তি ––শারীরিক বা মানসিক চাপ প্রয়োগ ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করবে না। শুধুমাত্র বৈষয়িক লোভ দেখিয়ে কাউকে ধর্মের পথে টানার চেষ্টাও তারা করবে না। যদি কেউ নেতিবাচক উত্তর দেয় , তাহলে মুসলমান কুরআনের আয়াতের আলোকে বলবে, ...তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে (সুরা কাফিরুন , ১০৯:৬)।

আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে সব বিশ্বাসের মানুষেরাই বাস করে। যেমন, খৃস্টান , ইয়াহূদী , বৌদ্ধ , হিন্দু , স্রষ্টায় অবিশ্বাসী, স্রষ্টায় বিশ্বাসী কিন্তু আসমানী কিতাবে অবিশ্বাসী , স্থানীয় মানুষ যারা হয়তো কোন ধর্মেই বিশ্বাসী নয় অথবা নিজস্ব কোন ধমীয় ধ্যান–ধারণায় বিশ্বাস করে ।

মুসলমানরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করার সময় অবশ্যই সব ধর্মের প্রতি সহনশীল হবে। ধর্ম বিশ্বাস যাদের যেমনই হোক তাদের সাথে ক্ষমাশীল , ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক আচরণ করবে। বিশ্বাসীদের দায়িত্ব হলো ধর্মের সৌন্দর্যের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া। আল্লাহ’র পথে মানুষকে আহ্বান করতে হবে ধৈর্য সহকারে ও শান্তিপূর্ণভাবে। এই বিশ্বাসকে গ্রহণ করা হবে কিনা , এই ধর্ম বিশ্বাসকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করবে কি না, এই সিদ্ধান্ত নেবে অন্য পক্ষ। কোন মানুষকে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা যাবে না; তার উপর জোর খাটানো যাবে না। কেননা, এটা কূরআনের নীতিমালা ভঙ্গ করে। প্রকৃতপক্ষে , আল্লাহ কূরআনে বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘ আর তোমার রব যদি চাইতেন , তবে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই সমবেতভাবে ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মানুষের উপর জবরদস্তি করবে যাতে তারা মু’মিন হয়ে যায় ? (সুরা ইউনুস, ১০: ৯৯)

‘ তারা যা বলে তা আমি খুব জানি। আর তুমি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নও। অতএব তুমি কূরআনের সাহায্যে উপদেশ দিতে থাকো তাকে , যে আমার আযাবের সতর্ক বাণীকে ভয় করে (সুরা কাফ, ৫০: ৪৫)।

মানুষকে আল্লাহ’র ইবাদত করার জন্য জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। এটা ইসলামের আদর্শের বিরোধী। স্রষ্টায় বিশ্বাস ও তাঁর ইবাদত করা ---এসব মূল্যবোধ আসে ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা থেকে। যদি কোন নিয়ম চালু করে মানুষের উপর জোর করে কোন ধর্ম বিশ্বাস ও উপাসনা পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়া হয় , তাহলে মানুষ ‘ ধার্মিক ’ হবে শুধুমাত্র ঐ নিয়মের কারণে ভয় পেয়ে । কিন্তু ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই মানুষ ধর্ম পালন করবে। এই সিদ্ধান্ত মানুষ একটি মুক্ত সমাজে থেকে নিজের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে স্বেচ্ছায় নেবে।

ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, মুসলিম শাসকরা অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল আচরণ করেছেন। তাঁদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। ভারত সরকারের অধীনে কর্মরত একজন ব্রিটিশ মিশনারী টমাস আর্নল্ড ইসলামের স্বাধীনতা বিষয়টি নিয়ে লিখেছেন : ‘...কিন্তু অমুসলিম জনগণের উপর সুসংগঠিতভাবে ইসলাম ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দেয়া বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্যাতন করে খৃস্ট ধর্মকে উচ্ছেদ করা -----এ ধরনের কোন কিছু আমরা শুনি না। মুসলমান খলিফারা যদি এর যে কোন একটি

উপায় বেছে নিতেন , তাহলে তারা হয়তো খৃস্ট ধর্মকে সম্পূর্ণই উচ্ছেদ করতে পারতেন। যেমনটি উচ্ছেদ করেছিল ফার্ণানেন্ড ও ইসাবেলা স্পেন থেকে ইসলামকে, ষোড়শ লুই ফ্রান্স থেকে প্রোটেস্টান ধর্মকে এবং ইংল্যান্ড থেকে ইয়াহূদীরা সাড়ে তিনশত বছর যেভাবে নির্বাসিত ছিল।

ধর্মীয় মতভেদের কারণে এশিয়ার পূর্ব দেশীয় গির্জাগুলো পৃথিবীর অন্য এলাকার সব গির্জা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। এমনকি সামান্য কথা বলার মতো সুসম্পর্কও ছিল না এদের মধ্যে। এরা কোন বিপদে পড়লে অন্যরা আঙুল তুলেও সাহায্য করতো না কেননা তারা মনে করতো এই গির্জাগুলি প্রচলিত খৃস্টমতের বিরোধী। তাই প্রাচ্যের গির্জাগুলির সেই আমল থেকে এখনো টিকে থাকাই মুসলিম শাসকদের সহনশীলতার জোরালো প্রমাণ (টীকা ১) ।

আল্লাহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন:

যথার্থ কারণ ছাড়া মানুষ হত্যা হলো ইসলামে অন্যতম বড় পাপ। কুরআনে বলা হয়েছে , '....কেউ কাউকে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ায় সব মানুষকেই হত্যা করলো ; আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করলো , সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো। তাদের কাছে তো এসেছিল আমার অনেক রাসুল স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে। কিন্তু এরপরও তাদের অনেকেই দুনিয়ায় সীমা লংঘনকারীই রয়ে গেল (সুরা মায়িদা, ৫: ৩২) ।

' আর তারা আল্লাহ'র সাথে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করে না; আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যাভিচার করে না। আর যে এমন করবে সে তো কঠিন আযাবের মুখোমুখি হবেই (সুরা ফুরকান, ২৫:৬৮)।

কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি যথাযথ কারণ ছাড়া নিরীহ মানুষকে খুন করে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে। আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন, এমন কি মাত্র একজন নিরপরাধকে খুন করার অর্থ হলো যেন পৃথিবীর সব মানুষকেই মেরে ফেলার মত পাপ করা। তাই , যে মানুষ আল্লাহ'র দেয়া সীমারেখা মেনে চলে , সে কখনোই

একজন মানুষেরই কোন ক্ষতি করবে না-- আর হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে বেপরোয়াভাবে হত্যা করার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

যারা মনে করে – সুবিচার হবে না এবং কোন শাস্তিও পেতে হবে না , তারা কখনোই সফলকাম হবে না। কেননা, একদিন আল্লাহ’র উপস্থিতিতে অবশ্যই তাঁদেরকে সব অপকর্মের জন্য দায়ী হতে হবে। এই কারনে যারা বিশ্বাসী , যারা জানে যে মৃত্যুর পরে একদিন সব কাজের জন্য দায়বধ্ধ হতে হবে, তারা আল্লাহ’র দেয়া সীমারেখা মেনে চলতে অতিরিক্ত যত্নবান হয়।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের সহানুভুতিশীল ও ক্ষমাশীল হতে আদেশ করেছেন:

পবিত্র কূরআনের ৯০ নং সুরার দুইটি আয়াতে ইসলামের নীতিমালার বর্ণনা দেয়া হয়েছে : “অত:পর সে তাদের দলে আসে যারা ঈমান আনে, এবং একে অন্যকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধরতে এবং উপদেশ দেয় দয়ামায়ার। এরাই ডান দিকের সৌভাগ্যশালী ” (সুরা বালাদ, ৯০:১৭-১৮)। আয়াত দুইটিতে বলা হয়েছে কোন গুণাবলীর ভিত্তিতে কেয়ামতের দিন একজন বিশ্বাসী নিজেকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে এবং বেহেশতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে । এরা হচ্ছে তারাই যারা ‘ পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের এবং উপদেশ দেয় দয়ামায়ার ’ ।

আল্লাহ’র প্রতি ভালবাসা থেকেই অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি আসে। স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা স্রষ্টার সৃষ্টিকে বেশী করে ভালবাসতে শেখায়। যে স্রষ্টাকে ভালবাসে , সে স্রষ্টার সৃষ্টির সাথে সরাসরি যোগাযোগ ও গভীর নৈকট্য অনুভব করে।

এই দৃঢ় ভালবাসা ও নৈকট্য যা সে নিজের মনের গভীরে অনুভব করে সেই স্রষ্টার প্রতি, যিনি তাকে ও পুরো মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। এই অনুভূতি তাকে সুন্দর নৈতিক আচরণে উদ্বুধ্ধ করে – যার আদেশ কূরআনে দেয়া হয়েছে। এই নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে বাস করায় তার পক্ষে সম্ভব হয় মানুষের প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতিশীল হওয়া। এই নৈতিক আদর্শ হলো ত্যাগ, সমানুভূতি ও ভালবাসায় পরিপুর্ণ।

এর বর্ণনা পবিত্র কুরআনে দেয়া হয়েছে এভাবে : “আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও পার্থিব ঐশ্বর্যের অধিকারী , তারা যেন কসম করে না বসে যে, তারা আত্মীয়–স্বজনকে , গরীব–মিসকিনকে এবং আল্লাহ’র রাস্তায় হিজরতকারীদেরকে দান করবে না; তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের দোষ উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে , আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন ? আর আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ” (সুরা নুর , ২৪: ২২)।

“আর তাদেরও হক রয়েছে এ সম্পদে , যারা মুহাজিরদের আসার আগে মদীনায় বসবাস করছে এবং ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে , তার জন্য নিজেদের মনে তারা হিংসা পোষণ করে না। আর নিজেরা অভাবী হলেও তাদেকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে। আর যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে তাঁরাই প্রকৃত সফলকাম ” (সুরা হাশর , ৫৯: ৯)।

“ .... এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা” (সুরা আনফাল , ৮: ৭৪)।

‘....... আর ভাল ব্যবহার করো পিতা–মাতার সাথে , আত্মীয়–স্বজনের সাথে , ইয়াতীমদের সাথে , মিসকীনদের সাথে , নিকট–প্রতিবেশী ও দুর–প্রতিবেশীর সাথে , সঙ্গী–সাথী ও পথচারীর সাথে এবং তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস–দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক , অহংকারী মানুষকে ’ (সুরা নিসা, ৪: ৩৬)।

‘ যাকাত তো শুধু তাদের হক যারা গরীব, মিসকীন , যারা যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত , যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন , এবং দাস মুক্তির জন্য , ঋণগ্রস্তদের জন্য , আল্লাহ’র পথে (সংগ্রামকারীদের জন্য) এবং মুসাফিরদের জন্য ---- এটা আল্লাহ’র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সব কিছুই জানেন, তিনি জ্ঞানী (সুরা তওবা, ৯: ৬০)।

পবিত্র কুরআনে যে উন্নত নৈতিকতার কথা বলা হয়েছে, সেটা বিশ্বাসীদের কাছ থেকেই দাবী করা হয়। এই উন্নত চরিত্রের প্রধান অবলম্বন হলো আল্লাহ’র প্রতি গভীর ভালবাসা। স্রষ্টার কাছে বিশ্বাসীদের এই পরিপুর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ; এই ধর্মভীরুরা কুরআনের যে কোন

নৈতিক উপদেশ তা যত সামান্যই মনে হোক না কেন , তা মেনে চলতে অতিরিক্ত যত্নবান।

বিশ্বাসীরা মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বিপদে সাহায্যের হাত বাড়ায় ; কিন্তু এর বিনিময়ে তাঁরা চায় না যে মানুষ তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার জালে আটকা থাকুক। তাঁরা এমন কি সামান্য ধন্যবাদও আশা করে না। কারণ, তাঁরা যে ভাল কাজ করে, তার লক্ষ্য হলো আল্লাহ'র পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন। তাঁরা জানে যে, কিয়ামতের দিন সব কাজের জন্য আল্লাহ'র কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে।

আল্লাহ বলেছেন, যারা জেনেশুনে কুরআনের আদর্শকে প্রত্যাখান করে, দোযখ হলো তাদের জন্যই। '' তোমাদের কিসে দোযখে ফেলেছে ? ওরা বলবে , আমরা মুসল্লী (সালাত আদায়কারী) ছিলাম না। আমরা গরীবকে খাবার দিতাম না'' (সুরা মুদাসসির , ৭৪: ৪২–৪৪) ।

' ....'ধরো ওকে , গলায় বেড়ি লাগাও , এবং নিক্ষেপ করো জাহান্নামে; আবার তাকে শৃংখলিত করো সত্তর হাত দীর্ঘ বাঁধনে , সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না ; আর গরীবকে খাবার দেয়ার জন্য অন্যকে উৎসাহিত করতো না (সুরা হাককাহ, ৬৯:৩০–৩৪)

' তুমি কি দেখেছো তাকে , যে দীনকে অস্বীকার করে? সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় , এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না (সুরা মাউন, ১০৭: ১–৩)

'...এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করো না (সুরা ফাজর, ৮৯:১৮)

এই সব আয়াতগুলিতে দেখা যায়, কুরআনে বলা হয়েছে, মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী করুণা ও সহানুভূতিশীল চরিত্রের অধিকারী। এই সব নৈতিক গুণাবলী যার মধ্যে নেই, তার পক্ষেই সম্ভব অসহায় ও নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস করা। সন্ত্রাসীদের চরিত্র হলো কুরআনে বর্ণিত নৈতিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন সন্ত্রাসী হলো নিষ্ঠুর ,

নির্মম চরিত্রের যে পৃথিবীর দিকে তাকায় ঘৃণা নিয়ে আর চায় হত্যা , ধবংস আর রক্তপাত।

একজন মুসলিম যে ইসলামের আদর্শে বড় হয়েছে , সে মানুষের কাছে যায় ভালবাসা নিয়ে। ভিন্ন মতকে সে সম্মান করে। যেখানে মতভেদ, বিবাদ , উত্তেজনা সেখানে সে ধৈর্য ও সংযমের সাথে সবার মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে। এই ধরণের ধর্ম বিশ্বাসীদের নিয়ে যে সমাজ গড়ে উঠবে , সেটি আরো অনেক উন্নত সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাবে। আজকের আধুনিক দেশগুলিতে যেমনটি দেখা যায় , তার চেয়েও বেশী উন্নত নৈতিকতা , ঐক্য , ন্যায়-বিচার দেখা যাবে সেখানে।

আল্লাহ ক্ষমা ও ধৈর্যের আদেশ দিয়েছেন:

‘ তুমি ক্ষমার অভ্যাস করো , ভাল কাজের আদেশ দাও...’ (সুরা আরাফ , ৭: ১৯৯)। ধৈর্য ও ক্ষমার এই আদর্শটি হলো ইসলামের অন্যতম মূল নীতি।

ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি মুসলমানরা যে তাঁদের জীবনে মেনে চলেছে, তা ইতিহাসের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়। মুসলমানরা যখন যেখানে গিয়েছিল , সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল মুক্তির বার্তা ও সহনশীলতা। এই বইয়ের শেষের দিকে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মুসলমানরা শুধু নিজ ধর্মের অনুসারীদের জন্যই নয় , বরং অন্য ধর্ম , মত, ভাষা, এলাকা নির্বিশেষে সবার কাছে ইসলামের আদর্শের বাণী পৌঁছে দিয়েছিল। ফলে মুসলিম শাসকদের সময় বিভিন্ন মতের মানুষেরা শান্তিতে মিলেমিশে একসাথে থাকতে পেরেছিল।

তুরস্কে শত শত বছর ধরে অটোমান সাম্রাজ্য বিশাল ভূ-খন্ড জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল ইসলামের ক্ষমা ও সহনশীলতার আদর্শের জন্যই। অন্য সব ধর্মের মানুষের তুলনায় মুসলমানরাই ছিল বেশী সহানুভূতিশীল ও ন্যায়-বিচারক। শত শত বছর ধরে তাঁরা খ্যাতি পেয়েছে সহনশীল ও শান্তিপ্রিয় জাতি হিসাবে। বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠা এই সমাজে অন্য ধর্মের মানুষেরা স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করতে পেরেছিল।

সহনশীলতা তখনই পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারবে যখন কুরআনের আদর্শ তাতে প্রতিফলিত হয়। এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কুরআনে বলা হয়েছে--- ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। যা ভাল তা দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করো, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে , সে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত হয়ে যাবে।(সুরা হা-মীম আস সাজদা , ৪১: ৩৪)

কুরআনের আয়াতগুলিতে আল্লাহ বারবার বলেছেন, ‘ ক্ষমা ’ হলো একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। একটি আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের সুখবর দিয়ে বলেছেন, যে ক্ষমা করে , আল্লাহ তাঁকে উত্তম পুরষ্কার দেবেন আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দ । তবে যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ-মীমাংসা করে, তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ’র কাছে। নিশ্চয় তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না (সুরা শুরা, ৪২: ৪০) ।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বিশ্বাসীদের সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেছেন, ‘ যারা স্বচছল ও অস্বচছল দুই অবস্থাতেই ব্যয় করে , আর তাঁরা রাগ দমন করে এবং মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে। যারা ভাল কাজ করে , আল্লাহ তাঁদেরকে ভালবাসেন (সুরা ইমরান , ৩: ১৩৪)।

কেউ যদি কোন মানুষের অপরাধকে ক্ষমা করে দেয় , তাহলে আল্লাহ সেটাকে পবিত্র আচরণ বলেছেন। এ নিয়ে সুরা মায়িদায় বলা হয়েছে , ‘ ...তুমি সবসময়ই অল্প কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাইকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবে; সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো ; নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককারদের ভালবাসেন (সুরা মায়িদা, ৫: ১৩)।

ইসলাম মানুষকে বলে পৃথিবীতে শান্তি , ঐক্য ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করতে । ইসলামের এই নীতি আর নির্দেশনাই কুরআনের আয়াতগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা যা এখন সন্ত্রাস নামে পরিচিত - তা পৃথিবীর মানুষের সব মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। এই সন্ত্রাস হলো কিছু অজ্ঞ ও ধর্মের নামে অতি উৎসাহী কিছু মানুষের পাগলামী ; যা কুরআনের আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

এই সব ব্যক্তির সাথে আসলে প্রকৃত ধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই। ধর্মের মুখোশ পরে কিছু সন্ত্রাসী ও তাদের দল বর্বরতা চালাচেছ। এর সমাধান হলো ইসলামের প্রকৃত আদর্শ সবাইকে শেখানো। অন্যভাবে বলা যায়, এখন সন্ত্রাসের যে উৎপাত , ইসলাম ও কুরআনের আদর্শের মধ্যেই রয়েছে তার সমাধান।

পবিত্র কুরআনের আলোকে যুদ্ধ:

কুরআনে যুদ্ধকে উপস্থাপন করা হয়েছে ‘ অপ্রীতিকর বাধ্যবাধকতা ’ হিসাবে । যখন কোন উপায় আর নেই , তখন শেষ উপায় হিসাবে যুদ্ধ পরিচালিত হবে। অবশ্যই যুদ্ধের সময়ও দয়া ও ধর্মীয় আদর্শের নীতিকে কড়াকড়িভাবে মেনে চলতে হবে।

কুরআনের আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে , যারা যুদ্ধ আগে শুরু করে তারা অবিশ্বাসী। আল্লাহ যুদ্ধ , অশান্তি পছন্দ করেন না : ‘ ..... যতবার তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায় ততবার আল্লাহ তা নিভান; এবং তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়; যারা ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় , আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না (সুরা মায়িদা, ৫: ৬৪)।

যখন মতভেদ চরম পর্যায়ে যায় তখনও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে বিশ্বাসীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। বিশ্বাসীরা তখনই যুদ্ধে যাবে যখন শত্রু আক্রমণ শুরু করে। যখন যুদ্ধই একমাত্র উপায় , শুধু তখনই মুসলমানরা নিজেদের যুদ্ধে জড়াবে–‘ যদি তারা (যুদ্ধ থেকে) বিরত হয় , তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু (সুরা বাকারা , ২: ১৯২)।

হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর জীবনী ভালভাবে পর্যবেক্ষন করলে এই সত্যই প্রকাশ পায় যে, যখন কোন উপায় থাকতো না , তখনই কেবল যুদ্ধকে একটি রক্ষণাত্মক কৌশল হিসাবে প্রয়োগ করা হতো।

রাসুল (দ:) এর কাছে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে আল্লাহ’র ওহী আসে। ওহী আসার প্রথম ১৩ বছর মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিসাবে মক্কায় পৌত্তলিকদের অধীনে ছিল। তখন মুসলমানরা নানা অত্যাচার–নির্যাতন সহ্য করে। ঘর–বাড়ি , জায়গা–জমি , টাকা–পয়সা লুট হওয়া থেকে শুরু করে শারীরিক নির্যাতনে মারা যায় অনেক মুসলমান। এই দীর্ঘ ১৩ বছর মুসলমানরা সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে চলে এবং সবসময়ই এই মূর্তি পূজারীদের বলতো শান্তির পথে চলতে।

যখন এই পৌত্তলিকদের অত্যাচার অসহনীয় হলো , তখন মুসলিমরা মক্কা ছেড়ে ইয়াথরিবে চলে যায় ।

{ অনুবাদকের সংযোজন : হযরত মুহাম্মাদ (দ:) মক্কা ছেড়ে এই নগরীতে হিজরত করার পর এর নতুন নাম দেয়া হয় মদীনাতুন্নবী বা নবীর শহর ; সংক্ষেপে মদীনা। }

মদীনার পরিবেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল এবং মুসলমানরা নিজেদের আইন সেখানে প্রতিষ্ঠা করে। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যপারটি ---- নিজেদের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লোভও মুসলমানদেরকে মক্কার কলহপ্রিয় শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে প্রলুব্ধ করতে পারে নি। হযরত মুহাম্মাদ (দ:) তখনই কেবল যুদ্ধের প্রস্তুতি মুসলমানদেরকে নিতে বললেন যখন ওহী আসলো : “ যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাঁদেরকে যারা আক্রান্ত , কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে; আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁদেরকে সাহায্য করতে পুরোপুরি সক্ষম ; তাঁদেরকে ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু এজন্য যে , তাঁরা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ .....(সুরা হাজ্জ , ২২:৩৯-৪০) ।

সংক্ষেপে বলা যায় , মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয় তখনই যখন তারা বছরের পর বছর ধরে অত্যাচার ও নানা ধরনের নির্যাতনের মধ্যে ছিল। অন্যভাবে বলা যায় , আল্লাহ মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে। অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি বা যুদ্ধের সময় কোনরকম বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়: ‘ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ’র নির্দেশিত পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো ; কিন্তু সীমা লংঘন করো না , নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না’ (সুরা বাকারা, ২: ১৯০)।

যুদ্ধের ওহী অবতীর্ণের পর মুসলমান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। কখনোই মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য প্ররোচনা দেয় নি। বরং হযরত মুহাম্মাদ (দ:) সবার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সাথে সন্ধি চুক্তি করেন , যা ‘ হুদায়বিয়ার’ সন্ধি নামে খ্যাত। এই চুক্তির সময় নবীজী (দ:) পৌত্তলিকদের প্রায় সব দাবীই মেনে নিয়েছিলেন। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে আবারো শত্রুতা শুরু করে যে দল, তারা ছিল পৌত্তলিক---মুসলমানরা নয়।

নও-মুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিশাল বাহিনী গঠন করে সমবেত হয়। অবশ্য হযরত মুহাম্মাদ (দ:) চরম সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন। তিনি চাইলেই মক্কার

পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে তাঁর চরম শত্রু মক্কার বিরোধী নেতাদের ক্ষমা করলেন।

বিজয় লাভের পর পরাজিত মক্কাবাসীদের প্রতি রাসুল (দঃ) চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই ঘটনার বিষয়ে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পাশ্চাত্যের জন এসপোসিটো বলেন , ‘ প্রতিশোধ গ্রহণ ও লুট করা এড়িয়ে হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করেন ; শত্রুর প্রতি তরবারী ব্যবহার না করে তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ’

হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এর এই মহানুভবতার প্রশংসা না করে পারে নি পৌত্তলিকরা। পরে তারা স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে।

শুধু মক্কা বিজয়ের সময়ই নয় , বরং হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এর সময়ে সব যুদ্ধেই অসহায় ও নিরপরাধ মানুষদের অধিকার রক্ষা করা হতো। এই ব্যপারে অত্যন্ত সতর্কতা গ্রহণ করা হতো। হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) অসংখ্যবার এই বিষয়টি বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষের সাথে হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এর নিজের আচরণও অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করে। যুদ্ধে যাওয়ার আগে হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) অবশ্যই বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে নীচের শর্তাবলীর কথা বলে দিতেন:-

আল্লাহ’র প্রতি আনুগত্যে অবিচল থেকে যুদ্ধে যাবে। কখনোই বৃদ্ধ , নারী ও শিশুদের সামান্য ক্ষতিও করবে না। সবসময় তাদের অবস্থা ভাল করার চেষ্টা করবে এবং তাদেরকে দয়া দেখাবে। যারা ভাল , আল্লাহ তাঁদেরকে ভালবাসেন (টীকা ৩)।
আল্লাহ’র রাসুল যুদ্ধের তীব্রতার মধ্যেও মুসলমানদের মানসিকতা কি হবে , তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন : ‘ শিশুদের হত্যা করবে না। গির্জায় যারা (খৃস্টান ধর্মযাজক) ধর্মীয় উপাসনায় জীবন উৎসর্গ করেছে , তাদের ক্ষতি করবে না , কখনো নারী ও বৃদ্ধদের হত্যা করবে না; গাছপালায় আগুন লাগাবে না বা গাছ কেটে ফেলবে না ; ঘর-বাড়ি কখনো ধবংস করবে না (টীকা ৪)।

হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর এই শান্তিপূর্ণ ও ধীর-স্থির নীতির কারন হলো পবিত্র কুরআনে আল্লাহর দেয়া আদর্শ। কুরআনে আল্লাহ বিশ্বাসীদের আদেশ দিয়েছেন অমুসলিমদের সাথে সদয় ও নায্য ব্যবহার করতে- ' আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না ভাল ব্যবহার ও ন্যায় আচরণ করতে তাদের সাথে , যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং তোমাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয় নি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়নদের ভালবাসেন। আল্লাহ তো তোমাদেরকে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন কেবল ঐ সব লোকের সাথে , যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে...(সুরা মুমতাহানা , ৬০: ৮-৯)

উপরের আয়াতগুলি ব্যাখ্যা করে দিয়েছে মুসলমানরা কিভাবে অমুসলিমদের সাথে ব্যবহার করবে। একজন মুসলমান অবশ্যই সব অমুসলিমদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে ; শুধু যারা ইসলামের শত্রু তাদেরকে বন্ধু হিসাবে মেনে নেবে না। যদি কখনো এই শত্রুতা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে রূপ নেয় , তখন মুসলমানরা পরিস্থিতির মানবিক দিক বিবেচনায় রেখে প্রতি উত্তর দেবে। সব ধরনের বর্বরতা, অপ্রয়োজনীয় সংঘর্ষ এবং অন্যায় আক্রমণ ইসলামে নিষিদ্ধ ।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ এসবের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সতর্ক করেন এবং বুঝিয়ে দেন যে , শত্রুর প্রতি প্রচন্ড রাগ যেন মুসলমানদেরকে কোন অন্যায় করতে প্ররোচিত না করে- ' ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবিচল থাকবে আল্লাহ'র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের কখনও প্ররোচিত না করে ন্যায় বিচার বর্জন করতে। ন্যায়- বিচার করবে। ন্যায়-বিচার করাই তাকওয়ার নিকটতর। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব খবর রাখেন সে বিষয়ে যা তোমরা করো (সুরা মায়িদা , ৫: ৮)।

জিহাদ এর প্রকৃত অর্থ:

আমাদের আলোচনার প্রেক্ষাপটে আরেকটি বিষয় ব্যাখ্যা করা দরকার , তাহলো জিহাদ। জিহাদের সঠিক অর্থ হলো ' চেষ্টা বা উদ্যম বা সংগ্রাম ' । তাই, ইসলামে জিহাদ পরিচালনার মানে হলো চেষ্টা করে যাওয়া । হযরত মুহাম্মাদ (দ:)

জিহাদের ব্যাখ্যা করে বলেছেন , ‘ সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো তাই যা একজন মানুষ তাঁর নিজের হীন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে করে ’ । হীন প্রবৃত্তি হলো মানুষের লোভ-লালসা , হিংসা, স্বার্থপর চিন্তা ও আকাংখা ইত্যাদি ।

কূরআনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুল্যায়ন করলে জিহাদের অর্থ এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে , যারা নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার করে , অবিচার করে এবং যারা সন্ত্রাস ও নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে মানব-অধিকার লঙ্ঘন করছে , সবসময় নিরীহ মানুষকে যাদের নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে --সেই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ভাল উদ্দেশ্যে কোন উদ্যোগ নেয়া হলো জিহাদ। এক্ষেত্রে জিহাদের লক্ষ্য হলো সমাজে শান্তি , সাম্য ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা ।

এই আদর্শগত ও আধ্যাত্মিক অর্থের পাশাপাশি শারীরিক সংগ্রামকেও জিহাদ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। তবে, আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে , জিহাদ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কৌশল হিসাবেই কেবল ব্যবহৃত হবে। কোন প্ররোচনা ছাড়া নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ চালানো হলে তা জিহাদ নয় বরং সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাস হলো অবিচার এবং জিহাদের প্রকৃত অর্থের বিকৃতি বা ভূল ব্যাখ্যা।

নিজেকে হত্যা (আত্মহত্যা) করা ইসলামে নিষিদ্ধ:

আমেরিকায় ২০০১ সালের সন্ত্রাসী আক্রমণ যা এখন ৯/১১ নামে পরিচিত তা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে--- তা হলো আত্মঘাতি হামলা। কিছু মানুষ যারা ইসলাম সম্পর্কে ভূল ও সামান্য ধারণা রাখে , তারা একটি মারাত্মক ভূল কথা বলে যে শান্তির ধর্ম ইসলাম আত্মঘাতি হামলাকে অনুমোদন করে। সত্যি কথা হলো , ইসলামে নিজেকে ও অন্য মানুষকে হত্যা দূটোই নিষিদ্ধ।

পবিত্র কূরআনের ভাষায় বলা যায় , ‘ তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না (সুরা নিসা, ৪: ২৯)। আল্লাহ আত্মহত্যাকে পাপ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাই , কারণ যাই থাকুক না কেন, কেউ নিজেকে মেরে ফেলবে --- ইসলামে এটা নিষিদ্ধ ।

হযরত মুহাম্মাদ (দ:) উপদেশপূর্ণ ছোট গল্প বলে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আত্মহত্যা পাপ। তিনি বলেছেন, অবশ্যই যে (ইচ্ছা করে) নিজেকে হত্যা করলো , সে দোযখের আগুনে শাস্তি পাবে। সেখানে সে চিরকাল থাকবে (টীকা ৫) ।

এটা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে , আত্মহত্যা করা এবং আত্মঘাতি হামলা চালিয়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে খুন করা ইসলামের আদর্শের চরম লঙ্ঘন। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন , নিজের জীবন নিয়ে নেয়া (আত্মহত্যা) হলো পাপ । সেজন্য , যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং দাবী করে যে কুরআনের আইন সে মেনে চলে , সে কখনোই আত্মহত্যা বা আত্মঘাতি হামলা করতে পারে না। শুধু তারাই এমন করতে পারে যাদের ধর্ম সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে , কুরআনের সত্যিকারের আদর্শ সম্পর্কে যাদের কোন রকম ধারণাই নেই এবং নিজের বিচার- বুদ্ধি ও বিবেক যারা খাটাতে ব্যর্থ হয়েছে। এরা নাস্তিকতার (যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না) আদর্শে প্রভাবিত এবং প্রতিশোধের নেশায় ঘৃণার অনুভূতিতে এদের মগজ ধোলাই করা হয়েছে। সবার উচিত এ ধরনের কাজের বিরোধিতা করা।

ইসলামের ইতিহাসে সহানুভূতি, ধৈর্য ও মানবিকতা :

আমরা এতক্ষণ যা যা তথ্য পেলাম , তার সার-সংক্ষেপ করে বলতে পারি যে, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ (অন্য কথায়, রাষ্ট্র ব্যাবস্থা সংক্রান্ত ইসলামিক আইন ও নীতি) হলো মধ্যমপন্থী ও অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ। এই সত্যকে অনেক অমুসলিম ঐতিহাসিক ধর্মতত্ত্ববিদ স্বীকৃতি দিয়েছেন। এদের একজন হলেন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কারেন আর্মস্ট্রং (ইনি আগে খৃস্টান ধর্মযাজিকা ছিলেন)। তাঁর ঐড়ষু ডধৎ বইতে ইসলাম, ইয়াহুদী ও খৃস্ট এই তিনটি পবিত্র ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কারেন বলেন , আরবী শব্দ সালাম ও ইসলাম শব্দের মুল উৎস একই--- যার অর্থ শান্তি। যুদ্ধ একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি যাকে নিন্দা করে কুরআনে বলা হয়েছে , এটা আল্লাহ'র অপছন্দের কাজ । বিধ্বংসী অন্যায় আগ্রাসনকে ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম এটার স্বীকৃতি দেয় যে কখনো কখনো যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন পথ থাকে না। কখনো আবার অন্যায় আগ্রাসন ও নির্যাতন বন্ধের উপায় হিসাবে যুদ্ধ করা একটি ইতিবাচক কর্তব্য হয়ে যায়। কুরআনের শিক্ষা হলো সীমিত পর্যায়ে ও যতদুর সম্ভব মানবিকতা বজায় রেখে যুদ্ধ করতে হবে। মুহাম্মাদকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল শুধু

মক্কাবাসীর সাথেই নয় , বরং ইয়াহুদী গোষ্ঠীগুলির সাথেও ; এছাড়া সিরিয়ার খৃস্টান দের একাধিক দল ইয়াহুদী দের সাথে একজোট হয়ে নবীর বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল। তবুও এসব কিছুই মুহাম্মাদকে আসমানী কিতাবের মানুষদের বিরুদ্দে নিন্দা করাতে পারে নি। তার মুসলিম বাহিনী আত্মরক্ষায় বাধ্য হয়েছিল কিন্তু তারা তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ‘ ধর্ম যুদ্ধে ’ লিপ্ত হয় নি।

মুহাম্মাদ তাঁর দাস জায়েদকে মুসলিম বাহিনীর প্রধান করে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি তখন জায়েদকে নির্দেশ দেন আল্লাহ’র পথে সাহসিকতা ও একই সাথে মানবিকভাবে যুদ্ধ করতে। মুসলিমরা অবশ্যই খৃস্টান ধর্মযাজক–যাজিকা , মঠে অবস্থানকারী সন্ন্যাসী , দুর্বল ও অসহায় ব্যাক্তি যারা যুদ্ধ করতে সমর্থ না, তাঁদের উপর কোনরকম অত্যাচার করবে না। কোন রকম গণহত্যা চালানো যাবে না। কোন একটি গাছও মুসলিমরা কেটে ফেলবে না বা একটি বাড়িও ধবংস করবে না (টীকা ৬) ।

নবীর মৃত্যুর পর যারা খলিফা হয়েছিলেন তাঁরাও ন্যায়–বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বিজিত দেশগুলিতে স্থানীয় অধিবাসী ও নবাগতরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বাস করেছিল। প্রথম খলিফা আবু বকর (রা:) তার জাতির কাছে দাবী করেছিলেন যে , অধিকৃত দেশগুলিতে থাকার সময় তারা যেন ন্যায় ও সহ্যশীল মনোভাব গ্রহণ করে। এসব হলো কুরআনের নৈতিক মূল্যবোধেরই প্রতিফলন।

প্রথম সিরীয় অভিযানের আগে আবু বকর (রা:) তার বাহিনীকে নীচের আদেশগুলি দিয়েছিলেন :– থামো তোমরা , শোন। আমি তোমাদের কিছু উপদেশ দিচ্ছি যা তোমরা মনে রাখবে।

কারো সাথে প্রতারণা করবে না ;
তোমরা কারো অঙ্গচ্ছেদ করবে না;
কখনো শিশু, বৃদ্ধ অথবা কোন নারীকে হত্যা করবে না,
খেজুর গাছ ধবংস করবে না, গাছে আগুন লাগাবে না বা ফলের গাছ কাটবে না ;
খাওয়ার প্রয়োজন না পড়লে কোন ভেড়া , উট বা গৃহপালিত প্রাণীকে জবাই করবে না ;
পথে তোমরা এমন কিছু মানুষকে পাবে যারা মাঠে বা নির্জনে বসবাস করে। তারা যে জীবনে আত্মনিয়োগ করেছে, সেভাবেই তাদেরকে থাকতে দিও ;

তোমরা হয়তো এমন অনেক মানুষকে পাবে যারা তোমাদেরকে উপহার হিসাবে নানা রকমের খাবার খেতে দেবে। তোমরা তা খেতে পারো তবে অবশ্যই আল্লাহ্’র নাম নিতে ভুলবে না (টীকা ৭) ।

আবু বকরের (রা:) পরবতী খলিফা উমর (রা:) বিখ্যাত হয়ে আছেন সুবিচার এবং বিজিত দেশগুলির মানুষদের সাথে নানা চুক্তি করে । খলিফা ওমরের (রা:) সময়কার প্রতিটি চুক্তি সহনশীলতা ও ন্যায়পরায়নতার প্রমাণ দেয় । উদাহরণ হিসাবে বলা যায় , লড ও জেরুসালেম বা জেরুজালেমে খৃস্টানদের আশ্রয়দানে তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন । কোন গির্জা যেন ধ্বংস না হয় এবং মুসলমানরা দল বেঁধে ইবাদত করতে কোন গির্জায় যেন না যায় ---খলিফা এই বিষয়গুলি নিশ্চিত করেছিলেন ।

খলিফা এইসব সুবিধাদি একই শর্তসমুহের আওতায় বেথলেহ্যামের খৃস্টানদেরও প্রদান করেছিলেন। মেডেন জয়ের সময় নেসটোরিয়ান গির্জার প্রধান তৃতীয় ইসহোয়াবকে (৬৫০-৬৬০ খ্রী:) চুক্তির আওতায় আশ্রয় দেয়া হয় ; নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে কোন গির্জাকে ধবংস করা হবে না; কোন অট্টালিকাকে মসজিদ বা বাসায় পরিণত করা হবে না।

মুসলমানদের এ বিজয়ের পর এই গির্জাপ্রধান পারসিয়ার এক ধর্মযাজককে এক চিঠি লেখেন । এই চিঠি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এই অর্থে যে আসমানী কিতাবের মানুষদের সাথে মুসলমানদের ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিচয় একজন খৃস্টানের জবানীতে প্রকাশ পেয়েছে:
এই আরবরা যাদেরকে স্রষ্টা এখন বিশ্বের শাসন ক্ষমতা প্রদান করেছেন .....খৃস্ট ধর্মকে নির্যাতন করে নি। অবশ্যই তাঁরা বরং অনুগ্রহ করেছে ; আমাদের ধর্মযাজকদের এবং স্বর্গীয় সন্তদের তাঁরা সম্মান করেছে এবং গির্জা ও মঠগুলিকে নানা সুবিধা দান করেছে...(টীকা ৮)।

এসব উদাহরণ হলো সত্যিকার বিশ্বাসীদের ন্যায় ও সহনশীলতার জোরালো প্রমাণ। আল্লাহ্ সুরা নিসায় বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানত পৌঁছে দাও প্রাপকদের কাছে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনা করবে তখন সুবিচার করবে। আল্লাহ যে উপদেশ তোমাদের দেন তা কত উত্তম। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন (সুরা নিসা; ৪: ৫৮)।

Anglican গির্জার একজন মিশন প্রধান ক্যানন টেইলার তাঁর এক ভাষণে ইসলামের আদর্শগত সৌন্দর্য বর্ণনা করে বলেন: ধর্মের মুল মতবাদগুলি ইসলাম সাথে করে এনেছে। যেমন: স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব ; তিনি ন্যায়-বিচারক ও ক্ষমাশীল ; স্রষ্টার হুকুমের প্রতি বান্দার আনুগত্য , আত্নসমর্পণ ও বিশ্বাস ।
ইসলাম মানুষের দায়িত্ব কী তা বলে দিয়েছে । ভবিষ্যত জীবনের কথা, শেষ বিচারের দিন, পাপীদের চরম শাস্তি পাওয়ার কথা , মানুষের প্রার্থনা করার বাধ্যবাধকতা , যাকাত দেয়া, রোজা রাখা, অন্যের উপকার করা ইত্যাদি।

ইসলাম কৃত্রিম মূল্যবোধ ও ধর্মের অসততা ও মুর্খতা , বিকৃত মানসিকতা ও ব্যাখ্যা করা কঠিন এমন সব ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে বিবাদকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দেয়..........ইসলাম ক্রীতদাসদের দিয়েছে আশা , মানবজাতিকে দিয়েছে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মানব চরিত্রের মৌলিক চাহিদাকে স্বীকৃতি দেয়। (টীকা ৯)

বিজিত দেশগুলিতে অমুসলিমদেরকে জোর করে মুসলমান বানানো হয়েছে , ইসলামের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ সব সময় করা হয়। পশ্চিমা গবেষকরা এটাকে অসত্য বলেছেন ও মুসলমানদের ন্যায়পরায়নতা ও সহনশীলতার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। একজন পশ্চিমা গবেষক এল ব্রাউন বলেছেন, ‘ খৃস্টান দের লেখায় এই মিথ্যা অভিযোগকে খুব আগ্রহের সাথে প্রচার করা হয় যে মুসলমানরা যেখানে গিয়েছে সেখানে তরবারীর ভয় দেখিয়ে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে । ঘটনাচক্রে , এই অভিযোগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ’ (টীকা ১০)।

ব্রাউন তার ‘ The Prospects of Islam’ বইতে লিখেছেন, মুসলিম অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা। ইতিহাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের এক বড় অংশই অন্য ধর্মের প্রতি সর্বোচ্চ ধৈর্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। ইসলামিক রাষ্ট্রে ইয়াহুদী ও খৃস্টান উভয়েই নিরাপত্তার মধ্যে বাস করেছে এবং ধমীয় স্বাধীনতা উপভোগ করেছে।

জন এল এসপোসিটো হলেন জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক। তিনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে ইয়াহুদী ও খৃস্টান রা মুসলিম শাসন আমলে চরম সহনশীলতার পরিচয় পেয়েছিল : মুসলিম বাহিনী এক ভীষন

শক্তিশালী বিজেতা হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করে। একই সাথে নিজেদেরকে ধবংসকারী নয় বরং প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তুলে ধরে। তাঁরা বিজিত দেশের শাসক ও সেন্যবাহিনীকে সরিয়ে দেয় কিন্তু স্থানীয় শাসনব্যবস্থা , আমলাতন্ত্র এবং সংস্কৃতির অনেক কিছুই বাঁচিয়ে রাখে। তাই অনেক বিজিত দেশেই মুসলমানদের বিজয় মানে ছিল কেবল শাসক দলের পরিবর্তন । তবে এই নতুন শাসক সেই সব মানুষকে শান্তি এনে দিল যারা বছরের পর বছর ধরে বাইজেনটাইন–পারসিয়ানদের যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য উচ্চহারে কর দিতে দিতে ও বিশৃঙ্খল অবস্থার কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিলো। স্থানীয় জনগণ স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন যাত্রা চালিয়ে যেতে পেরেছিল । বাইজেনটিয়াম ও পারসিয়ার শাসন আমলের তুলনায় মানুষ বরং মুসলমানদের শাসন–ব্যাবস্থাকে অনেক নমনীয় ও সহনশীল পেয়েছিল।

ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারতো যেমন নিজেদের উপাস্যদের উপাসনা করা ; বিয়ে , তালাক , উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশ মেনে চলতে পারা ইত্যাদি । এসবের বিনিময়ে তাঁদেরকে রাজস্ব কর দিতে হতো যা ‘ জিযিয়া ’ নামে পরিচিত। জিযিয়া কর দেয়ার কারণে মুসলিম বাহিনী বাইরের শত্রুদের আক্রমণ থেকে অমুসলিমদের রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতো এবং সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই দিত। এই কারণেই জিযিয়া কর প্রদানকারী বিজিত দেশের মানুষদের ‘ জিম্মি (সুরক্ষিত) ’ বলা হতো যার অর্থ এদেরকে সুরক্ষা বা নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। এসব কারণে , জিম্মি হওয়ার অর্থ আসলে হতো অল্প কর , স্থানীয় পর্যায়ে বেশী স্বাধীনতা, একই সেমেটিক (আরব–ইয়াহূদী) জাতিভুক্ত শাসক দলের অধীনে থাকা । বাইজেনটিয়াম আমলের গ্রীক – রোমান শাসকদের চেয়ে বরং মুসলমানদের সাথে স্থানীয়দের ভাষা ও সংস্কৃতিগত অনেক মিল ছিল।

ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা জিম্মি অবস্থায় মুসলমান শাসনে অধিকতর ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করেছে। খৃস্টান অর্থোডক্স গির্জা ধর্মীয় মতভেদের কারণে Nestorians, Monophysites, Jacobites , Copts সহ অধিকাংশ গির্জার সাথেই সম্পর্ক শেষ করে দেয় এবং তাদেরকে ধর্ম বিরোধী আখ্যা দেয়। এসব নির্যাতনের কারণে কিছু ইয়াহূদী ও খৃস্টান দল অভিযানকারীদের স্বাগত জানিয়ে সাহায্য করে। তাদের কাছে মুসলমানরা ছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের তুলনায় কম পীড়াদায়ক। নানা দিক থেকে , মুসলমানদের বিজয়গুলি ছিল যুদ্ধ সাজে সজ্জিত এলাকায় ইসলামের শান্তির দাওয়াত বয়ে নিয়ে আসা(টীকা ১১) ।

ইসলাম আরেকটি শান্তি নিয়ে আসে ; সেটা ঘটে নারীদের জীবনে। প্রাক-ইসলামী যুগে মেয়েরা সমাজে সাংঘাতিকভাবে নির্যাতিত হতো। পশ্চিমা একজন অধ্যাপক বার্ণাড লুইস-- যাকে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ের অন্যতম সেরা বিশেষজ্ঞ হিসাবে ধরা হয় , তিনি বলেছেন:-

সামগ্রিকভাবে ইসলাম প্রাচীন আরব সমাজে মেয়েদের অবস্থার অভুতপূর্ব উন্নতি সাধন করে। ইসলাম নারীকে সম্পত্তি ও আরো অনেক কিছুতে অধিকার দান এবং স্বামী ও মালিকদের অত্যাচার থেকে সুরক্ষা দেয় । শিশু কন্যা হত্যা যা আরবে বহুল প্রচলিত ও অনুমোদিত একটি প্রথা ছিল , তা ইসলাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে। নারীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে ও তারা গরীব থেকে যায় যখন স্থানীয় ঐতিহ্য ও আগেরকার মানসিকতার কারণে ইসলামিক আইনের পরিবর্তন সাধন করা হয় ; ফলে ইসলামের মুল বার্তা তার শক্তি হারিয়ে ফেলে ।১২

ইসলামের ধৈর্য ও সহনশীলতার নীতি প্রয়োগের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে সেলজুক টার্ক ও অটোমান সাম্রাজ্যকাল । সেলজুক (মুসলিম) শাসকদের আওতায় খৃস্টান রা নিজের ইচ্ছায় আসতে চাইতো। এই বিষয়ে ব্রিটিশ গবেষক স্যার থমাস আর্লন্ড তার ‘ *The Spread of Islam in the World* ’ বইতে লিখেছেন, মুসলিম শাসকদের অধীনে নিরাপত্তা থাকবে বুঝতে পেরে এশিয় মাইনরের অনেক খৃস্টানই ত্রাণকর্তা হিসাবে সেলজুক শাসকদের আগমণকে সেই সময় স্বাগত জানিয়েছিল। অষ্টম মাইকেলের শাসন আমলে (১২৬১-১২৮২ খ্রী:) এশিয় মাইনরের অনেক ছোট ছোট রাজ্যের জনগণ সেলজুক শাসকদের আমন্ত্রণ জানাতো তাঁদের রাজ্যকে মুসলিম শাসনের আওতায় আনতে ; যাতে তারা তখনকার (খৃস্টান) শাসকের নির্মম অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে পারে। ধনী-গরীব নির্বিশেষে অনেক অমুসলিম স্বেচ্ছায় তুর্কির মুসলিম শাসকদের অধীনস্থ এলাকায় বসবাসের জন্য নিজ এলাকা ছেড়ে চলে আসতো (টীকা ১৩)।

সেলজুক সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জল সময়ের একজন হলেন মালিক শাহ। তিনি তাঁর অধীনস্থ এলাকার মানুষদের সাথে

অত্যন্ত সহনশীল ও চরম ধৈর্যশীল ছিলেন। সেজন্য মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে স্মরণ করতো । বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক যারা, তাঁরা সবাই তাঁদের লেখায় মালিক শাহের ন্যায়-বিচার ও সহনশীলতার উল্লেখ করেছেন। মালিক শাহের ধৈর্য ও সহনশীলতা আসমানী কিতাবের মানুষদের মনে তাঁর প্রতি ভালবাসার প্রদীপ জ্বালিয়েছিল। সেজন্য স্বেচ্ছায় অনেক খৃস্টান প্রধান এলাকা তাঁর শাসনাধীনে এসেছিল। এই ধরণের ঘটনা ইতিহাসে নজিরবিহীন।

স্যার থমাস একজন খৃস্টান যাজকের স্মৃতিচারণের উল্লেখ করেছেন । এই যাজক হলেন সেন্ট ডেনিশ গির্জার সন্ন্যাসী Odo de Diogilo । ইনি দ্বিতীয় ক্রুসেড অভিযানে সপ্তম লুইসের ব্যক্তিগত চ্যাপলিন হিসাবে অংশ নেন। এই খৃস্টান যাজক তাঁর স্মৃতিচারণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি মুসলিম শাসকদের ন্যায়-বিচারের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই স্মৃতিচারণকে ভিত্তি করে স্যার থমাস লিখেছেন, অসহায় মানুষদের দু:খ দেখে যদি মুসলমানদের মনে দয়ার উদ্রেক না হতো, তবে ঐ অসহায় বেঁচে যাওয়া (অমুসলিম) মানুষদের অবস্থা আরও শোচনীয় হতো। মুসলমানরা অসুস্থদের সেবা করতো ; অভাবীদের দু:খ দূর করেছিল এবং কু-সংস্কার দূর করতে খুব আগ্রহী ছিল। গ্রীকরা তীর্থ যাত্রীদের কাছ থেকে কৌশলে বা জোর করে মুদ্রা কেড়ে নিত ; অথচ মুসলমানরা মুক্ত হস্তে গরীবদের মধ্যে দান করতো। খৃস্টান তীর্থযাত্রীদের প্রতি অবিশ্বাসীদের দয়া আর খৃস্টান শাসকদের নৃশংস আচরণের মধ্যে কতই না পার্থক্য ছিল। (খৃস্টান) গ্রীকরা তীর্থযাত্রীদের মারধর করতো ; সামান্য যা টাকা-পয়সা তাঁদের কাছে রয়ে যেত , তাও কেড়ে নিত ; জোর করে তাদের উপর দাসত্বের শৃঙ্খল চাপাতো । অনেক অমুসলিমই তাই স্বেচ্ছায় তাঁদের ত্রাণকর্তা মুসলমানদের ধর্ম গ্রহণ করতো।

এই সব ঘটনার লেখক Odo de Diogilo বলেছেন, খৃস্টান রা নিজেদের ধর্মের মানুষ যারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করতো তাদের চেয়ে বরং বিদ্রোহী মুসলমানদের কাছেই বেশী নিরাপদে ছিল । খৃস্টান শাসক থেকে এই মুসলমানরা এদের প্রতি অনেক বেশী সহানুভূতিশীল ছিল । আমরা শুনেছি , তিন হাজারেরও বেশী অমুসলিম অবসর গ্রহণের পর স্বেচ্ছায় তুর্কি শাসকদের অধীনে চলে গিয়েছিল। ১৪

ঐতিহাসিকদের এই সব মন্তব্যে প্রকাশ পাচ্ছে , যে সব মুসলিম শাসকরা ইসলামের আদর্শ সত্যিকারভাবে গ্রহণ

করেছিল তারা ধৈর্য, সহনশীলতা ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। যেমন অটোমান সাম্রাজ্য তিনটি মহাদেশে শত বর্ষ ধরে অফুরন্ত সহনশীল আচরণ ও ধৈর্য্যের প্রমাণ রেখেছে। স্পেন ও পর্তুগালে খৃস্টান ক্যাথলিক শাসনে ইয়াহূদীরা যখন নির্মম গণহত্যার শিকার হয়ে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয় ; তখন দ্বিতীয় সুলতান বায়েজিদ আমলে ইয়াহূদীরা অটোমান সাম্রাজ্যে আশ্রয় পেয়েছিল। মুসলিমদের অধীনে ইয়াহূদীদের নিরাপদ বসবাসের এই ঘটনা ইসলামের মহান আদর্শের অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ ।

ক্যাথলিক রাজারা যারা স্পেনের বিভিন্ন রাজ্য সে সময় শাসন করতো , তারা ধর্ম পরিবর্তন করতে ইয়াহূদীদের উপর প্রচন্ড জোর খাটায়। অথচ এর আগে মুসলিম শাসকদের অধীনে আন্দালুসিয়ায় ইয়াহূদীরা খৃস্টান ও মুসলমানদের সাথে শান্তিততে বসবাস করতো। খৃস্টান রাজারা স্পেনের পুরো জনগণকে খৃস্টান বানানোর চেষ্টা করে। ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে ইয়াহূদীদের উপর অত্যাচারের পাশাপাশি মুসলিমদের বিরুদ্ধে খৃস্টানরা যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ কারণে, স্পেনের দক্ষিণ অঞ্চল গ্রানাডা থেকে ১৪৯২ খৃস্টাব্দে শেষ মুসলিম শাসক ক্ষমতাচ্যুত হয়। যুদ্ধ জয়ী খৃস্টানরা পরাজিত মুসলমানদেরকে গণহারে নির্মমভাবে হত্যা করে। যে সব ইয়াহূদী খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে , তাদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ঘর-বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে এই সব দেশহারা ইয়াহূদীদের একটি দল অটোমান সাম্রাজ্যে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে ; রাষ্ট্র তাঁদের প্রার্থনা অনুমোদন করে। কামাল রেইসের অধীনে অটোমান যুদ্ধজাহাজ বিতাড়িত ইয়াহূদী ও যে সব মুসলমান নির্মম হত্যাকান্ড থেকে রক্ষা পেয়েছিল তাঁদেরকে অটোমান রাজ্যে নিয়ে আসে।

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ সবচেয়ে ধার্মিক শাসক হিসাবে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৪৯২ সালে তিনি এই সব নির্যাতিত , বিতাড়িত ইয়াহূদীদেরকে তাঁর সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন (বর্তমান গ্রীসের থেসালোনিকা ও এডার্ণ)।

বর্তমানে তুরস্কে যে ২৫ হাজার ইয়াহূদী বাস করে , তাঁদের অধিকাংশই এই সব স্পেনিশ ইয়াহূদীদের বংশধর। পাঁচশত বছর আগে এরা স্পেন থেকে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি তুরস্কে নিয়ে আসে। তুরস্কে তাঁরা নিরাপত্তার সাথে বসবাসের পাশাপাশি নিজেদের স্কুল, হাসপাতাল , বয়স্ক নিবাস , সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং নিজস্ব পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করে। তাঁদের নিজস্ব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান আছে , বিভিন্ন পেশায়

তাঁদের প্রতিনিধি রয়েছে; বিভিন্ন কারিগরী পেশা থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং বিভিন্ন ক্রমবর্ধমান বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমন্ডলে তাঁরা নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইয়াহূদী বিদ্বেষী মনোভাব প্রবল থাকায় সেখানে শত বছরেরও বেশী সময় ধরে ইয়াহূদীদের নানা ধরণের ভয়ের মধ্যে থাকতে হয় ; এমন কি প্রায়ই ইয়াহূদীদের উপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনাও ঘটে। কিন্তু তুরস্কে ইয়াহূদীদের এসব কিছুই কখনো সহ্য করতে হয় নি। তাঁরা সবসময়ই সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বাস করে এসেছে। ইসলাম যে সহনশীলতা ও ন্যায়পরায়নতা বয়ে নিয়ে এসেছিল , মুসলিম শাসনে ইয়াহূদীদের নিরাপত্তার মধ্যে বসবাসের এই একটি ঘটনাই তা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ।

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ যে সহনশীলতা ও উদারতা অমুসলিমদের প্রতি দেখিয়েছিলেন , পরবর্তীতে অটোমান সুলতানদের সবাই তা অনুসরণ করেছিলেন। যখন সুলতান গবযসবঃ কনসটেনটিনোপোল জয় করেন, তখন তিনি ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের স্বাধীনভাবে সেখানে বসবাসের অনুমতি দেন। ইসলামী বিশ্ব ও মুসলিম শাসকদের সহনশীলতা ও ন্যায়পরায়নতা নিয়ে অনেক মূল্যবান লেখা লিখেছেন আন্দ্রে মিকেল । তিনি বলেন, খৃস্টান সম্প্রদায় (মুসলিমদের অধীনে) সুশাসিত রাষ্ট্রে বাস করতো যে সুযোগ তাঁরা বাইযেনটাইন ও ল্যাটিন যুগে পায় নি। মুসলিম শাসনে খৃস্টানরা কখনোই নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয় নি। বরং বলা যায়, খৃস্টান শাসক কর্তৃক নির্যাতিত স্পেনীয় ইয়াহূদীদের জন্য মুসলিম এলাকা বিশেষ করে ইস্তাম্বুল নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। কখনোই জোর করে ইসলাম গ্রহণে মানুষদের বাধ্য করা হয় নি; ইসলামিকরণ ছিল সামাজিক ক্রমোন্নতির ফল ।

এসব বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ করে যে , মুসলিমরা কখনোই অত্যাচারী শাসক ছিল না। বরং তাঁরা সব জাতির কাছে শান্তি , নিরাপত্তা ও বিশ্বাস পৌঁছে দিয়েছিল। মুসলিমরা আল্লাহ’র সেই আদেশ শুনতো যেখানে বলা হয়েছে , ‘ আর তোমরা ইবাদত করো আল্লাহ’র এবং আল্লাহ’র সাথে কাউকে শরীক করো না । ভাল ব্যবহার করো পিতা–মাতার সাথে , আত্মীয়স্বজনের সাথে , ইয়াতীমদের সাথে , মিসকীনদের সাথে , নিকট ও দূর প্রতিবেশীদের সাথে , সঙ্গী–সাথী ও পথচারীর সাথে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস–দাসীদের সাথে । নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক আত্ম–গর্বিত

মানুষকে (সুরা নিসা, ৪: ৩৬)---মুসলমানরা তাই সব মানুষের সাথেই ভাল ব্যবহার করতো।

সংক্ষেপে বলা যায় , বন্ধুত্ব ; ভ্রাতৃত্ববোধ ; শান্তি ও ভালবাসা হলো কুরআনের আদর্শের ভিত্তি। আর এসব হলো শ্রেষ্টতর গুণাবলী যা অর্জন করতে মুসলমানরা সচেষ্ট থাকে। (এ নিয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন হারুন ইয়াহিয়ার লেখা বই ‘ কুরআনে ন্যায়-বিচার ও সহনশীলতা ’) ।

যারা ধর্মের নামে সন্ত্রাস করে , সেই সব সন্ত্রাসীদের প্রকৃত চেহারা :

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা বিভিন্ন উদাহরণ প্রমাণ করে যে, নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আক্রমণ পরিচালনা করা ইসলামের মৌলিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই, এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত যে কোন মুসলমান এই ধরণের অন্যায় কাজ করবে। বরং, মুসলমানদের দায়িত্ব হলো , এই ধরণের সন্ত্রাসীদের থামানো ; পৃথিবীর বুক থেকে ‘ অশান্তি দুর করা ’ এবং পৃথিবীর সব মানুষের কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা পৌঁছে দেয়া। ইয়াহুদী সন্ত্রাস , খৃস্টান সন্ত্রাস বা ইসলামিক সন্ত্রাস এভাবে চিহ্নিত করে কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয় । অবশ্যই আমরা যদি এই সব অপরাধীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখবো, এর পিছনে কোন ধর্মীয় নীতি কাজ করছে না, বরং সামাজিক কারণই দায়ী।

ক্রুসেডার : এই বর্বররা নিজেদের ধর্মকে অপমানিত করেছে:
একটি ধর্মের সত্যিকার বাণী বা আদর্শ ধবংস বা বিকৃত হতে পারে সেই ধর্মেরই মিথ্যা অনুসারীদের জন্য । এর একটি উদাহরণ হলো ক্রুসেডাররা । তারা যা করেছে , তা খৃস্ট ধর্মের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়।

এই ক্রুসেডাররা হলো ইউরোপীয়ান খৃস্টান। তারা একাদশ শতাব্দীর শেষে মুসলমানদের কাছ থেকে পবিত্র ভূমি (জেরুসালেম ও সংলগ্ন এলাকা) উদ্ধার করার নামে যুদ্ধ অভিযান শুরু করে। তারা নিজেরাই এই অভিযানের মধ্যে একটি তথাকথিত ধর্মীয় ছোঁয়া দেয় যদিও যেখানে তারা যায় সেখানেই সৃষ্টি করে ত্রাসের রাজত্ব।

অভিযানের পথে তারা নিরীহ মানুষদের গণহারে হত্যা করে; অসংখ্য গ্রাম ও শহরে দস্যুতা করে। জেরুসালেম জয়

করে সেখানে তারা রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। আগে যেখানে জেরুসালেমে ইসলামিক আইনের অধীনে মুসলিম ও অমুসলিমরা শান্তিতে বাস করতো , সেখানে বিজয়ী ক্রুসেডাররা কোনরকম ক্ষমা প্রদর্শন না করে নির্বিচারে মুসলমান ও ইয়াহুদী দের হত্যা করে। একজন ঐতিহাসিকের ভাষায়, ‘ তারা স্যার্যাসেন (যে সময় ধর্মযুদ্ধ হয় সেই সময়কার মুসলমান) ও তুর্কীদের মধ্যে যাকে যেখানে পেয়েছে ---- সে নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন , তাকেই হত্যা করেছে (টীকা ১৬) ।

একজন ক্রুসেডার Aguiles এর রেইমন্ড এই সংঘর্ষ সম্পর্কে অত্যন্ত দম্ভভরে বলে, ভীষণ সুন্দর সব দৃশ্য দেখা গেল। আমাদের দলের কিছু যোদ্ধা (এরাই ছিল সবচেয়ে ক্ষমাপরায়ন) শত্রুদের মাথা কেটে ফেলে , অনেকে তীর ছুঁড়ে শত্রুদের আহত করে , তাই তারা উঁচু চূড়া থেকে পড়ে যায় ; অনেক যোদ্ধা আগুনে ছুড়ে ফেলে অনেকক্ষণ কষ্ট দিয়ে শত্রুদের মারে ; শহরের রাস্তায় রাস্তায় মৃতদের কাটা হাত-পা-মাথার স্তুপ জমে যায় ; রাস্তায় চলার জন্য মৃতদের ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়েছিল । কিন্তু সলোমনের মন্দিরে যা হয়েছে তার তুলনায় এসব অত্যন্ত সামান্য ব্যপার। স্বাভাবিকভাবে মন্দিরে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠিত হয় , কিন্তু .... এই মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় রক্তের মধ্যে ক্রুসেডারদের ঘোড়ার হাঁটু ও লাগাম পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল.... (টীকা ১৭)।

যেভাবে বর্ণনা করা হলো সেরকম নৃশংসভাবে ক্রুসেডাররা মাত্র দুই দিনে চল্লিশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে (টীকা ১৮)।

ক্রুসেডারদের বর্বরতা এতটাই চরমে পৌঁছেছিল যে , চতুর্থ ক্রুসেড অভিযানের সময় তারা কনসনেন্ট্যানিপোল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) যা ছিল খৃস্টান অধ্যুষিত শহর সেখানে হামলা চালায় আর গির্জাগুলি থেকে সোনার জিনিষপত্র লুট করে নিয়ে যায়। অবশ্যই এই ধরণের নৃশংসতা খৃস্ট ধর্মের আদর্শের বিরোধী। নিউ টেষ্টামেন্ট এর ভাষ্য অনুসারে খৃস্ট ধর্ম হলো ‘ ভালবাসার বাণী ’ । বাইবেলে বলা হয়েছে , যে তোমার শত্রু তাকে ভালবাসো আর যে তোমাকে নির্যাতন করে তার জন্য প্রার্থনা করো (ম্যাথিউ ৫: ৪৪)। সুসমাচারের কোথাও সন্ত্রাস করতে অনুমতি দেয়া হয় নি। তাই নিরীহ মানুষকে হত্যা করা অকল্পনীয় একটি ব্যপার। সুসমাচারে ‘ নিরপরাধ মানুষকে হত্যার’ যে ধারণাটি আপনি পাবেন , সেটি শুধু হলো এক নিষ্ঠুর ইয়াহুদী রাজা হেরোড কর্তৃক শিশু যীশু { হযরত ঈসা (আ:) } কে হত্যা করার চেষ্টার ঘটনাটি।

খৃস্ট ধর্ম যদি ভালবাসার ধর্ম হয় যেখানে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই , তাহলে কি করে ক্রূসেডাররা ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম হত্যাকান্ডগুলি ঘটালো ? এর কারণ হলো , ক্রূসেডারদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল অজ্ঞ , অশিক্ষিত--- যাদেরকে বলা যেতে পারে ‘ইতর ’ শ্রেণীর লোক। এরা নিজেদের ধর্মীয় আদর্শ সম্পর্কে কিছুই জানতো না ; এরা খুব সম্ভবত জীবনে কোনদিন নিজেদের ধর্মগ্রন্থ পড়া তো দুরে থাক , বোধ হয় চোখেও দেখে নি। তাই তারা সুসমাচারের মহান আদর্শের কথা কিছুই জানতো না । ক্রূসেডের নেতারা সে সময় শ্লোগান দিত যে এই যুদ্ধ ও সন্ত্রাস হলো ‘ ঈশ্বরের ইচ্ছা ’ । সাধারণ যোদ্ধারা এই শ্লোগান ও মতবাদে প্রভাবিত হতো। এই মিথ্যা শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে যোদ্ধারা ধর্মযুদ্ধে নৃশংস আচরণ করতো যা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের ধর্মের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ।

পূর্বাঞ্চলীয় খৃস্টান -----বাইযেনটিয়ামের মানুষেরা সংস্কৃতিগত দিক থেকে পশ্চিমা খৃস্টান দের থেকে অনেক আলাদা ছিল। এই খৃস্টান মানবিক মুল্যবোধকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। যুদ্ধ জয়ের আগে ও পরেও অর্থোডক্স খৃস্টান রা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে ছিল। টেরি জোনস , বিবিসি’র ভাষ্যকারের মতে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ক্রূসেডারদের চলে যাওয়ার পরে সভ্য জীবনযাত্রা আবার শুরু হয় । এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী তিন ধর্মের মানুষেরা আবার শান্তিতে এক সাথে থাকতে শুরু করে (টীকা ১৯)।

ক্রূসেডাররা সাধারণ সামাজিক অবস্থার একটি নির্দেশক। একটি আদর্শের অনুসারীরা যত বেশী অসভ্য ও অশিক্ষিত , বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা যাদের মধ্যে যত কম, তারাই বেশী করে সন্ত্রাসকে আশ্রয় করে কাজ করে। ধর্মের সাথে এদের আদর্শের কোন মিল থাকে না। পুরো পৃথিবীতেই কমিউনিষ্ট আন্দোলন চলার সময় সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়া হয়েছিল ; তবে সবচেয়ে বেশী রক্ত ঝরিয়েছে কম্বোডিয়ার রেড খেমাররা। এর কারণ , আন্দোলনকারীদের মধ্যে এরাই ছিল সবচেয়ে বেশী অশিক্ষিত।

পবিত্র কূরআনে বেদূইন (আরব যাযাবরদের) চরিত্র :

হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর সময় প্রাচীন আরবের সামাজিক কাঠামো প্রধানত: দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। আরবের শহর এলাকায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছোঁয়া ছিল। বাণিজ্যিক কারণে

নিজ এলাকার বাইরের পৃথিবীর সাথে আরবের শহরের বাসিন্দাদের যোগাযোগ ছিল। এটা ‘ ভাল ব্যবহার ’ শিখতে আরবের শহুরের লোকদের সাহায্য করেছিল । তাঁরা মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্যবোধের অধিকারী ছিল , সাহিত্য বিশেষ করে কবিতা উপভোগ করতে জানতো। অন্যদিকে , যাযাবর মরুবাসীরা আরবের প্রত্যন্ত এলাকায় থাকতো ; এরা ছিল অত্যন্ত স্থূল রুচির ও অমার্জিত । শিল্পকলা , সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা কিছুই জানতো না। তাই সুক্ষ রুচির কোন চর্চাও তারা করতো না ।

ইসলামের জন্ম ও বিকাশ হয় মক্কায় ---আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়। ইসলাম যখন এই এলাকার সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে , তখন মক্কাবাসী ছাড়াও অন্য সব উপজাতির মানুষেরা ইসলাম কবুল করে। এদের মধ্যে মরুবাসীরাও ছিল , তবে এদের অনেকেই সন্দেহের কারণে ইসলাম কবুল করে নি। অশিক্ষা ও স্থূল রুচির জন্য ইসলামের গভীরতা ও মহান দৃষ্টিভঙ্গী এরা উপলব্ধি করতে পারে নি। এ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, ‘ মরুবাসীরা কুফরী ও মোনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর এবং তারা সেসব হুকুম-আহকাম না জানারই যোগ্য যা আল্লাহ তাঁর রাসুলের উপর নাযিল করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ , হেকমতওয়ালা ’ (সুরা তওবা, ৯: ৯৭)।

আরববাসীদের মধ্যে মরুবাসীরাই ছিল ‘ কুফরী ও মোনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর ’ এবং আল্লাহ’র অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকতো। হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর সময় এরা মুসলিম বিশ্বের একটি অংশে পরিণত হয়। পরবর্তীতে এরা ইসলামের অনুসারীদের জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। বেদুইনদের মধ্যে একটি দল ছিল ‘ খারিজী ’ যাদেরকে বিদ্রোহী গোষ্ঠি বলা হতো । এরা ছিল সবচেয়ে বিপথগামী গোত্র যারা সুন্নী মতাদর্শ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল । বন্য স্বভাব ও ধর্মীয় উন্মাদনা ছিল এদের বৈশিষ্ট্য। কুরআনের আদর্শকে এরা সামান্যই বুঝতো ; এরা প্রায় সব মুসলিম দলের সাথেই যুদ্ধে লিপ্ত হয় ; কুরআনের কিছু আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা করে খারিজীরা এই সব যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং নানা ধরণের সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত হয়। হযরত আলী (রা:) যিনি হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন এবং যাকে রাসুল (দ:) জ্ঞানের দরজা বলে অভিহিত করেছিলেন , তাকে এই বিদ্রোহী দলেরই একজন হত্যা করে।

আরো পরে আরেকটি নিষ্ঠুর দল হাসিসীর জন্ম হয়। এরা ছিল পুরোপুরি একটি সন্ত্রাসী দল , অজ্ঞ ও ধর্মোন্মাদ আক্রমণাত্মক স্বভাবের মানুষেরা ছিল এই দলের সদস্য। পবিত্র কুরআনের

মহান আদর্শ থেকে এরা অনেক দুরে ছিল। তাই যে কোন লোভনীয় প্রস্তাব বা যুদ্ধের শ্লোগানেই এরা প্রভাবিত হতো।

ক্রুসেডাররা যেভাবে খৃস্ট ধর্মের আদর্শকে বিকৃত করে ভুল ব্যাখ্যা করেছিল এবং ধর্মের নামে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিল , ইসলামকে অপব্যাখ্যা করে তেমনি কিছু দলের জন্ম হয়েছে যার সদস্যরা বিকৃত মানসিকতার এবং যারা সন্ত্রাসকে আশ্রয় করে তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করছে। ক্রুসেডার ও এই সব দলের মধ্যে একটি মিল রয়েছে ; তাহলো তাদের ‘বেদুইন ’ চরিত্র। এরা হলো অশিক্ষিত , অমার্জিত ও স্থুল স্বভাবের এবং বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করে না। নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান এদের নেই। ধর্মীয় আদর্শ সম্পর্কে জানা না থাকাতেই এরা সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। যদিও এরা ভুল করে দাবী করে যে , ধর্ম তাদের সন্ত্রাসকে অনুমোদন করে।

নিষ্ঠুর স্বভাবের সন্ত্রাসীর একমাত্র লক্ষ্য হলো ধ্বংসলীলা :

রাশিয়ার অরাজকতা সৃষ্টির হোতা মাইকেল বেকুনিন ও তার শিষ্য নিকাভেভ একজন আদর্শ সন্ত্রাসীকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে , ‘ একজন (রাষ্ট্র বিপ্লবীর) সব কাজ বেঁচে থাকে শুধু তার কথায় নয় বরং কাজে ---- সমাজের প্রচলিত নিয়ম-কানুনেন বিরুদ্ধে , তথাকথিত সভ্য পৃথিবীর আইন , নৈতিকতা ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে ; বিপ্লবী হলো আপোষহীন প্রতিপক্ষ .....সে শুধু একটি সত্যই জানে , তাহলো ধ্বংসের জ্ঞান। (The Alarm Newspaper Article, "Bakunin's Ground-Work for the Social Revolution," 1885 Dec. 26, p. 8)

এই দু’জনের কথায় বোঝা যাচ্ছে যে সন্ত্রাসীরা সামাজিক ও আধ্যাত্মিকসহ সব ধরণের প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদেরকে আলাদা মনে করে । এভাবে তারা সব নৈতিক মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করে । এসব প্রতিষ্টানগুলিকে তারা মনে করে তাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পথের বাঁধা হিসাবে । বেকুনিন আরো বলে , ‘ দিন-রাত্রির সবসময়েই (বিপ্লবীর) একমাত্র চিন্তা ও লক্ষ্য হলো ক্ষমাহীন ধবংস । যখন সে ঠান্ডা মাথায় ক্লান্তিহীনভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে , তখন সে নিজেও যে কোন সময়ে মারা যাবে এই প্রস্তুতি তার থাকবে। যে কেউ তার কাজে বাঁধা দিতে আসবে , তাকে নিজের হাতে খুন করার জন্য একজন বিপ্লবী সবসবময় নিজেকে তৈরী রাখবে। ’

সামাজিক বিপ্লবের মুলতত্ত্ব প্রতিবেদনে বেকুনিন সন্ত্রাসীর চরিত্র সম্পর্কে আরো লিখে , নিজের প্রতি কঠোর হওয়ার সাথে সাথে তাকে অন্যদের প্রতি কঠোর হতে হবে; যে কোন পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্কর্কের চেয়ে বিপ্লবী কাজের প্রতি ভালবাসা অবশ্যই প্রাধান্য পাবে । ভালবাসা , কৃতজ্ঞতাবোধ এ ধরণের সব দুর্বল আবেগকে দমন করতে হবে । ’

এই কথাগুলি সন্ত্রাসের অন্ধকার জগতকে উলঙ্গ করে দেখিয়েছে। এটা আরো দেখাচ্ছে যে , এই মতবাদ ইসলামী আদর্শের একেবারে বিপরীত। ইসলাম শান্তি , সহনশীলতা ও ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। কূরআনের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন , শান্তির পথেই হলো মানুষের মুক্তির পথ। শান্তির বিপরীত অশান্তি ও বিরোধের পথকে খুঁজে বেড়ানোর অর্থ হলো শয়তানের পথকে অনুসরণ করা। ‘ হে যারা ঈমান এনেছো; তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু(সুরা বাকারা , ২: ২০৮)।

সন্ত্রাসের দলগত মনস্তত্ত্ব:

সন্ত্রাসীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তারা সমবেত উৎসাহ ও আবেগে কাজ করে। দলীয় সাহস ও উদ্দীপনার মধ্যে কাজ করার সময় ব্যক্তিগত মতামত কোন গুরুত্ব পায় না। কেননা, সবাই একটিমাত্র গন্তব্যে যাওয়ার জন্য একসাথে কাজ করছে। দলের সাথে থেকে এমন অনেক কাজ অনেকে করে যা সে একাকী সুস্থ মস্তিস্কে কখনোই করতো না। নিজের বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা না খাটিয়েই দলের মধ্যে থেকে অনেক কিছু করতে হয়। অনেক দেশেই সন্ত্রাসী দল গঠিত হয়েছে কিছু অশিক্ষিত ও বুদ্ধিহীন মানুষদের নিয়ে। এরা অদম্য মানসিক ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কী করছে তা বুঝে উঠতে পারে না। গণমিছিলে অংশ নিয়ে , দলগতভাবে শ্লোগান দিতে দিতে কেন একটা কাজ তারা করছে , তা না বুঝেই এরা নৃশংস আচরণ করে বসে।

এক মুহূর্তের মধ্যেই এই ধরণের আবেগপ্রবণ মানুষেরা নিজেকে খুনীতে পরিণত করতে পারে। আবেগের বশে এরা

নিরপরাধ মানুষের রক্ত ঝরানো থেকে শুরু করে যে কোন অমানবিক কাজই করতে পারে।

একজন মানুষ যখন একাকী থাকে তখন তাকে মনে হয় ধীর–স্থির , শান্ত। কিন্তু এই একই ব্যক্তি যখন কোন সন্ত্রাসী দলের অংশ হয় , তখন তেমন কোন কারণ ছাড়াই সে মানুষের ঘর–বাড়িতে আগুন লাগানো থেকে শুরু করে নারী নির্যাতন ইত্যাদি যে কোন খারাপ কাজ করতে পারে। এদেরকে এমনভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয় যে নিজের প্রাণ দিতেও এরা আর দ্বিধা করে না। যারা সন্ত্রাসে অংশ নেয় , তাদের বেশীরভাগই দুর্বল চিত্তের।এরা উত্তেজিত একটি দল যা করে, যেদিকে যায় , ভেড়ার পালের মত তারাও সেদিকেই একসাথে ছুটে। শুভ বুদ্ধি আর বিচার করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায় তখন; অতিরিক্ত ও অবিবেচনাপ্রসুত আবেগ এবং সন্ত্রাসের প্রতি ঝোঁক পেয়ে বসে তাদের। এ ধরণের আবেগপ্রবণ মানুষরা খুব সহজেই উত্তেজিত হয় আর অল্পতেই অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। কখন , কোথায় থামতে হবে তার কোন নিয়ম–নীতি এরা জানে না, মানে না।

দলগত মনস্তত্ত্বের এই ভুল দিকের কথা পবিত্র কুরআনে প্রকাশ করা হয়েছে । আল্লাহ ১৭ নং সুরার ৩৬নং আয়াতে বলেছেন, মানুষ অবশ্যই নিজের বিচার–বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করবে। “ যে বিষয়ের ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই (অযথা) ;সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না, কেননা (কিয়ামতের দিন) কান , চোখ ও অন্তর, এই সব কয়টিই জিজ্ঞাসিত হবে (সুরা বনী ইসরাঈল ; ১৭:৩৬)

সন্ত্রাসের একটি উৎস :তৃতীয় বিশ্বে ধর্মোন্মত্ততা

বর্তমানে ‘ ইসলামিক সন্ত্রাস’ বিষয়টি পুরো বিশ্ব জুড়েই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। তথাকথিত এই ইসলামিক সন্ত্রাসের প্রকৃতি ইতিহাসের বিভিন্ন উদাহরণ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি। এরা হচ্ছে সেই সন্ত্রাসী যারা ধর্মের নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন অন্যায় কাজ করে। যারা এ ধরণের অন্যায় করে এবং এদের সন্ত্রাসকে সমর্থন যারা করে , তারা আসলে ইসলামের নামধারী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। এরা হলো ,‘ বেদুইন চরিত্রের’––––ইসলামের প্রতিনিধিত্ব এরা করছে না।

ইসলামের মহত্ব এরা বুঝতে পারে না; তাই শান্তি ও ন্যায়ের ধর্ম ইসলামকে এরা ব্যবহার করছে নৃশংস কাজের উপকরণ হিসাবে।

এই নৃশংসতা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ফলাফল। এই বর্বরতার জন্য দায়ী তৃতীয় বিশ্বের ধর্মোন্মত্ততা। এটা হচ্ছে তাদের কাজ যাদের মনে মানুষের প্রতি কোন দয়া-মায়া নেই। এদের মন নীতিহীনতার অন্ধকারে ডুবে আছে।

এটা অত্যন্ত সত্যি কথা যে , গত কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পশ্চিমা শক্তি ও তাদের দোসরদের দ্বারা মুসলিমরা নানাভাবে অত্যচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। ইউরোপীয় কলোনীর রাষ্ট্রসমুহ , স্থানীয় আগ্রাসী শাসক বা পাশ্চাত্যের সমর্থনপুষ্ট উপনিবেশবাদী শক্তি (যেমন ইসরাঈল) মুসলমানদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে কুরআনের নীতিমালার আলোকেই। কুরআনের কোথাও সন্ত্রাসের বদলে সন্ত্রাস করতে উৎসাহ দেয়া হয় নি। বরং আল্লাহ বলেছেন, ভাল দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করো ; “ (হে নবী) , ভাল আর মন্দ কখনোই সমান হতে পারে না; তুমি ভাল (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) কে প্রতিহত করো, তাহলেই (তুমি দেখতে পাবে) তোমার মধ্যে এবং যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিলো , এমন (অবস্থা সৃষ্টি) হয়ে যাবে-যেন সে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ; (সুরা হা-মীম আস সাজদা ; ৪১:৩৪)।

নৃশংস আচরণের প্রতিবাদ জানানোর বৈধ অধিকার মুসলমানদের রয়েছে। তবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সময় কখনোই ঘৃণায় অন্ধ হওয়া যাবে না বা অন্যায়ভাবে শত্রুতা করা যাবে না। আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণের সময় মুসলমানদের সতর্ক করে বলেছেন , ‘ ....তোমরা (শুধু) নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারেই একে অন্যকে সাহায্য করবে ; পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে (কখনো) একে অন্যকে সাহায্য করো না । সবসময়ই আল্লাহকে ভয় করো , কেননা আল্লাহতালা (পাপের) শাস্তি দিতে অত্যন্ত কঠোর (সুরা মায়িদা, ৫:২)।

নিরপরাধ মানুষদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস করে নিজেদেরকে ‘ বিশ্বের নির্যাতিত মানুষদের প্রতিনিধি’ হিসাবে দাবী করা একটি মিথ্যা ও হাস্যকর অজুহাত যা ইসলামের চেতনার বিরোধী। মুসলমানদের প্রতি যে অত্যাচার চলে এসেছে এবং হচ্ছে তার জন্য কিন্তু পশ্চিমা সব দেশ ও জাতি দায়ী নয়। এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ । আসলে বস্তুবাদী এবং ধর্মহীন আদর্শ ও নীতি যা ১৯ শতাব্দী থেকে বিশ্বে প্রচলিত তাই প্রধানত: দায়ী এসব দু:খজনক ঘটনাগুলির জন্য।

খৃস্ট ধর্ম থেকে ইউরোপীয় উপনিবেশ জন্ম লাভ করে নি। বরং খৃস্ট ধর্মের আদর্শ বিরোধী মনোভাবই উপনিবেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ১৯ শতাব্দীর নৃশংসতম আচরণগুলির মূলে রয়েছে ডারউইনের সামাজিক মতবাদ। পশ্চিমী সমাজে এখনো নৃশংস , ক্ষতিকর অনেক উপাদান রয়েছে; একই সাথে ন্যায় ও শান্তির সংস্কৃতিও বিদ্যমান ; যার মূলে রয়েছে খৃস্টধর্মের মাহাত্ম্য। আসলে মুল বিরোধ পশ্চিমা বিশ্ব ও ইসলামের মধ্যে নয়। প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বলা যায় , পশ্চিমা ও ইসলামী বিশ্বের ধার্মিক মানুষদের সাথে মূল বিরোধ হলো ভোগবাদী , নাস্তিক ও ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদ ও মতবাদের বিশ্বাসীদের মধ্যে।

তৃতীয় বিশ্বের ধর্মোন্মত্ততার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এর পক্ষে আরেকটি যুক্তি হলো , ধর্মোন্মত্ততাকে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাম্যবাদী মতবাদের সাথেই এক করে দেখা হতো। সোভিয়েত সমর্থিত পশ্চিমা বিরোধী কমিউনিষ্ট দল ষাট ও সত্তরের দশকে পশ্চিমা দেশগুলির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস করতো। কমিউনিষ্ট আদর্শ যখন থেকে ম্লান হওয়া শুরু করে, তখন যে সামাজিক কাঠামো এই সব কমিউনিষ্ট দলকে জন্ম দিয়েছিল , তারা ইসলামের দিকে নজর দেয়। সাবেক কমিউনিষ্ট আদর্শের মধ্যে কিছু ইসলামী ধারণা ও প্রতীকের সংযোগ ঘটিয়ে এখন ‘ধর্মের নামে বর্বরতা’ চালানো হচ্ছে। এটা ইসলামের মুল নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই বিষয়ে শেষ মন্তব্য হলো , ইসলাম কোন নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির কাছে অদ্ভুত কিছু নয়। আধিপত্যবাদী পশ্চিমা শক্তির মতবাদের বিপক্ষে বলা যায় , ইসলাম শুধু ‘ প্রাচ্যের ধর্ম বা সংস্কৃতি ’ নয়। ইসলাম সমগ্র মানবজাতির কাছে স্রষ্টার মনোনীত চূড়ান্ত ধর্মমত হিসাবে এসেছে। সব মানুষকে ইসলাম সত্যের পথ দেখায় । মুসলমানদের দায়িত্ব হলো এই সত্য ধর্মের দাওয়াত সব জাতির , সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া

এবং তারা যেন ইসলামের সাথে একাত্মতা অনুভব করতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা।

সব মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য্য পৌঁছে দিতে হবে , যাতে মানুষ প্রকৃত ইসলাম কী তা বুঝতে পারে এবং ইসলামের মধ্যে বাস করতে পারে। যারা ইসলামের নামে সন্ত্রাসকে আশ্রয় করছে , বিশ্বে অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম করেছে এবং পৃথিবীকে আরো সুন্দর করার বদলে একটি ভয়ংকর স্থানে পরিণত করেছে , তাদের জন্য ইসলামের দাওয়াত একটি চমৎকার সমাধান হতে পারে।

সমাজে আতংক ও আকস্মিক ভীতি সৃষ্টি করা হলো সন্ত্রাসের অন্যতম পদ্ধতি:

সন্ত্রাসী আক্রমণের শিকার হিসাবে যে কোন বয়স ও ধর্মের মানুষকে বেছে নেয়া হলো সন্ত্রাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সন্ত্রাসের ভীতি সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হলো এই যে, সন্ত্রাসীরা নির্বিচারে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে যে কোন সময় , যে কাউকে বেছে নেয়। ফলে কেউ-ই নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে না।

যখন একজন মানুষ জানে যে, কোন কারণ ছাড়াই সে সন্ত্রাসী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে, তখন সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে সে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে না। সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য একজন কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না; কেননা সন্ত্রাসীরা নিজেদের ইচ্ছামত, যখন-তখন , যেখানে-সেখানে সন্ত্রাস করে। এভাবে একটি সমাজে স্বেচ্ছাচারী আক্রমণ কোন পূর্ব-সংকেত না দিয়েই ঘটানো হয়।

রাজনীতিতে চরম মতবাদের দোষ-ত্রুটি বা ভুল দিক:

সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনার সময় আরেকটি মত আমাদের পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তাহলো রেডিক্যালিজম (রাজনীতিতে চরম মতবাদ)। সমাজে রাতারাতি চরম ধ্বংসাত্মক বিপ্লব ঘটানোর জন্য কঠোর আপোষহীন নীতির প্রয়োগকে সমর্থন করাই হলো জধফরপধষরংস (রেডিক্যালিজম)।

এই চরমপন্থীরা কঠোর নীতিতে বিশ্বাসী ; আগ্রাসী মনোভাব হলো এদের আরেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কূরআন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে পথ দেখায়। পবিত্র কূরআনের আলোকে চরম রাজনৈতিক মতবাদকে আমরা যদি পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখবো যে আল্লাহ্ আমাদেরকে যেভাবে চলতে বলেছেন তার সাথে এই মতবাদের কোন মিল নেই।

আল্লাহ কূরআনে বিশ্বাসীদের চিত্রিত করেছেন ভদ্র, নম্র , শান্তি প্রিয় মানুষ হিসাবে যারা অশান্তি আর কলহ থেকে দূরে থাকে ; চরম শত্রুভাবাপন্ন মানুষের সাথেও বন্ধুর মত কথা বলে। এ ব্যপারে কূরআনের একটি উদাহরণ আমাদের আরো দিক-নির্দেশনা দেয়। আল্লাহ হযরত মুসা (আ:) ও হযরত হারুণ (আ:) কে ফেরাউনের কাছে গিয়ে সুন্দরভাবে তার সাথে কথা বলতে আদেশ) দেন ‘ তোমরা দু’জনে (অবিলম্বে) ফেরাউনের কাছে চলে যাও , কেননা সে মারাত্মকভাবে সীমা লংঘন করেছে। (হেদায়াত পেশ করার সময়) তোমরা তার সাথে নম্রতার সাথে কথা বলবে, হতে পারে সে তোমাদের উপদেশ কবুল করবে অথবা (আমার) ভয় করবে (সূরা তা হা ২০: ৪৩-৪৪)।

অত্যাচারী বাদশাহ ফেরাউন ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও বিদ্রোহী অবিশ্বাসীদের মধ্যে অন্যতম। এক আল্লাহকে অস্বীকার করে সে অনেক দেব-দেবীর পূজা করতো। যারা আল্লাহতে বিশ্বাস রাখতো (ঐ সময়ে মিসরে অবস্থিত ইসরাঈলদের) উপর ফেরাউন অকথ্য অত্যাচার চালাতো। এক আল্লাহতে বিশ্বাসী অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষকে ফেরাউন নির্মম নির্যাতন করে মেরে ফেলেছিল। তবুও আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে (দ:) আদেশ দিয়েছিলেন এমন এক নিষ্ঠুর , হিংস্র স্বভাবের মানুষের কাছে গিয়ে নম্রভাবে কথা বলতে। কূরআন ভাল করে পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবে, আল্লাহ যে পথ দেখিয়েছেন তাহলো বন্ধুত্বপূর্ণ সংলাপ------কঠোর বাক্য , উত্তেজনাপূর্ণ শ্লোগান , অথবা আগ্রাসী আন্দোলন নয়। এমন আরো কিছু উদাহরণ আছে যা মুসলমানদেরকে পথ দেখায় কিভাবে আলোচনা করতে হবে। কূরআনের ১১নং সুরায় বলা হয়েছে , হযরত শু‘আয়ব (আ:) মানুষকে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধকে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

নবী শু‘আয়ব (আঃ) এসব করেছিলেন বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে ও নম্রতার সাথে ; সুরা হুদের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত ঘটনার কারণ আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি (১১: ৮৪–৮৮)। যখন শু‘আয়ব (আঃ) বললেন, ...‘ আর আমি তো তোমাদের পাহারাদার নই’, তখন তিনি বুঝিয়েছেন যে তিনি তাঁদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চান না; তাঁর একমাত্র ইচ্ছা হলো আল্লাহ’র কাছ থেকে যে সত্য তাঁর কাছে এসেছে , সে সম্পর্কে মানুষকে জানানো। ‘ আপনি তো একজন ধৈর্যশীল ও ভাল মানুষ’–––এই কথা অবিশ্বাসীরা বলেছিল হযরত শু‘আয়ব (আঃ) কে। এতে বোঝা যায় , শু‘আয়ব (আঃ) এর ব্যবহার এত ভদ্র ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল যে অবিশ্বাসীরাও তাঁর ভাল ব্যবহারের প্রশংসা না করে পারে নি।

‘হে আমার কওম, তোমরা কি ভেবে দেখেছো ? ’–– শু‘আয়ব (আঃ) এর এই প্রশ্ন আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি সেই সব মানুষদের নিজেদের বিচার–বুদ্ধি খাটাতে বলেছেন। অন্যভাবে বলা যায় , শু‘আয়ব (আঃ) তাঁদের সাথে জেদ করেন নি বা তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন নি; বরং তাদের মতের বিরুদ্ধে থেকেও নম্রভাবে আহ্বাণ করেছেন এবং তাদেরকে আল্লাহ’র পথে আসার জন্য সুন্দরভাবে দাওয়াত দিয়েছেন যাতে তারা সত্যের ডাককে বিবেচনা করে।

স্বাধীনভাবে চিন্তা করে নিজের বিবেক খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে নবী শু‘আয়ব (আঃ) মানুষকে অনুরোধ করেছিলেন। ‘ আর আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যা করতে মানা করি আমি নিজেই সে কাজ করি’––– নবী শু‘আয়ব (আঃ)এর এই কথা মুলতঃ নিষেধাজ্ঞা নয় ; তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে কিছু আচরণ হলো পাপ এবং মানুষকে আহ্বাণ করেছেন যেন তারা সেগুলি না করে। যখন নবী শু‘আয়ব (আঃ) বললেন , ‘ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে নই ’ , তখন তিনি বুঝিয়েছেন তাদের সাথে তর্ক–বিতর্ক–কলহে লিপ্ত হওয়ার কোন ইচ্ছা তাঁর নেই; তিনি তাদেরকে অস্বস্তিতে ফেলতে চান না এবং তাদের মধ্যে কোন ঝগড়া–বিবাদ সৃস্টি হোক্ তাও তিনি চান না। তিনি শুধু তাদেরকে সত্যের পথের দাওয়াত দিতে চান এবং উচ্চ নৈতিক আচরণ যেন তারা করে সেজন্য অনুরোধ করেন।

কুরআন শরীফ পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখি সব নবী ও রাসুল (দঃ) ছিলেন ভদ্র, নম্র , ধৈর্যশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের অধিকারী। সুরা তওবায় আল্লাহ নবী ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেন , ‘ অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও সহনশীল হিসাবে (সুরা তওবা, ৯: ১১৪)।

কুরআনের আরেকটি আয়াতে হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এর নৈতিকতার বর্ণনা এসেছে এভাবে, ‘ এটা আল্লাহ’র এক (অসীম) দয়া যে , তুমি এদের সাথে ছিলে কোমল প্রকৃতির (এর বিপরীত) যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষ হতে , তাহলে এসব লোকেরা তোমার আশপাশ থেকে সরে যেতো। অতএব তুমি এদের অপরাধসমূহ মাফ করে দাও , এদের জন্য আল্লাহ’র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজকর্মের ব্যাপারে এদের সাথে পরামর্শ করো......(সুরা ইমরান; ৩:১৫৯)।

একজন মুসলমান কোন অবস্থাতেই চরম রাগ দেখাবে না। একজন মুসলমান অন্যদের থেকে শুধু এটাই চাইবে যে তারা যেন এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করে এবং নৈতিক আচরণ করে; কিন্তু এটা শুধু আল্লাহ’র করুণার উপর নির্ভরশীল। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত বা সত্যকে পৌঁছে দিতে ; তাদের কাছে যত ব্যাখ্যাই দেই না কেন , মানুষের মনের উপর কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই। আল্লাহ কুরআনে এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যের কথা মুসলমানদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘ যদি কুরআনের (অলৌকিক ক্ষমতা) দিয়ে পাহাড়কে গতিশীল করে দেয়া যেতো কিংবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করে দেয়া হতো অথবা (তা দিয়ে) যদি মরা মানুষের সাথে কথা বলা যেতো, (তবুও এই না-ফরমান মানুষগুলো ঈমান আনতো না) কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে; অতঃপর ঈমানদাররা (একথা জেনে) কি নিরাশ হয়ে পড়লো যে, আল্লাহ চাইলে সমগ্র মানব সন্তানকেই হেদায়াত দিতে পারতেন....... (সুরা আর রা’দ ; ১৩:৩১)।

আরেকটি আয়াতেও এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে.... “ (হে নবী); তোমার মালিক চাইলে এ পৃথিবীতে যতো মানুষ আছে, তারা সবাই ঈমান আনতো। (কিন্তু তিনি তা চাননি, তাছাড়া) তুমি কি জোর জবরদস্তি করে চাইবে যে, তারা সবাই মুমিন হয়ে যাক ? ’ (সুরা ইউনুস ; ১০: ৯৯)।

তাই মুসলমানদের দায়িত্ব হলো শুধু সত্যের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া আর তাদেরকে সত্য কবুল করতে সুন্দরভাবে আহ্বান জানানো। মানুষ সত্যের দাওয়াতকে কবুল করবে কি না, তা একান্তই তার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার ব্যপার। আল্লাহ কূরআনে এই সত্য জানিয়ে দিয়েছেন যে ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই...‘ (আল্লাহ’র) দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই; (কারণ) সত্য মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে; তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহ’র (দেয়া জীবন আদর্শের) উপর ঈমান আনে , সে যেন এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো যা কোনদিনই ছিড়ে যাবার নয়। আল্লাহ সব কিছুই শুনেন এবং সব কিছুই জানেন। ” (সুরা বাকারা,২:২৫৬)। সেজন্য অমুসলিমদের জোর করে মুসলমান বানানো যাবে না; বা কাউকে আল্লাহ’র ইবাদত করতে বাধ্য করা যাবে না। কেবল উপদেশ দিতে হবে , সুন্দর করে বুঝাতে হবে।

হযরত মুহাম্মাদ (দ:) কে আল্লাহ কয়েকটি আয়াতে বলে দিয়েছেন যে , মুসলমানরা অত্যাচারী নয়...‘ (হে নবী) তারা যা কথাবার্তা বলে , তার সব কিছুই আমি জানি, তুমি তো তাদের উপর জোর- জবরদস্তি করার কেউ নও---এরপর এই কূরআন দিয়ে তুমি সেই ব্যক্তিকে সৎ উপদেশ দাও , যে আমার শাস্তিকে ভয় করে; সুরা কাফ (৫০: ৪৫)। (হে নবী) ; তুমি বলো , হে মানুষ ; তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সত্য (দীন) এসেছে ; অতএব , যে হেদায়াতের পথ অবলম্বন করবে , সে তো তার নিজের ভালোর জন্যই হেদায়াতের পথে চলবে , আর যে গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) থেকে যাবে , সে তো গোমরাহীর উপর চলার কারণেই গোমরাহ হয়ে যাবে । আমি তো তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক নই; (সুরা ইউনুস ; ১০: ১০৮)।

নীতিগতভাবে মুসলমানদের দায়িত্ব হলো কেবল নিজ ধর্মকে ব্যাখ্যা করা, কারো উপর জোর-জবরদস্তি করা নয়। মুসলমানরা আল্লাহ’র কাছ থেকে আদেশপ্রাপ্ত যে সবচেয়ে অন্যায় ব্যবহারকারী মানুষের কাছেও ভদ্র, নম্রভাবে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে।

মুসলমানরা কখনোই চরমপন্থী হতে পারে না। কেননা, মুসলমানদের যে সব গুণ কূরআনে বলা আছে চরমপন্থীদের বৈশিষ্ট্য সে সবের বিপরীত। অবশ্যই , চরমপন্থী নীতি ও মতবাদ অনৈসলামিক এবং ইসলামিক বিশ্বে এটা প্রবেশ করেছে বাইরে থেকে। বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো পরীক্ষা করলে

আমরা দেখবো, এই সব চরম মতবাদ ও ঘোষণা অতীতে কমিউনিষ্টরা অথবা ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত গোঁড়া ও উগ্র যুক্তিহীন, ক্ষিপ্ত স্বভাবের মানুষেরা ব্যবহার করেছে। এসবের কোন স্থান ইসলামে নেই .....‘ (এ কারণেই) যখন এই কাফেররা নিজেদের মনে জাহেলিয়াতের ঔদ্ধত্য জমিয়ে নিয়েছিল, তখন (তাদের মোকাবেলায়) আল্লাহ তাঁর রাসুলের উপর ও (তাঁর সাথী) মুমিনদের উপর এক মানসিক প্রশান্তি নাযিল করে দিলেন, (এই অবস্থায়ও) তিনি তাঁদের আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতির উপর কায়েম রাখলেন, (মুলত) তারাই ছিলো (আল্লাহ’র পক্ষ থেকে প্রশান্তি পাওয়ার) অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি, আল্লাহতালা সব কিছুর ব্যাপারেই যথার্থ জ্ঞান রাখেন ” (সুরা ফাতাহ ; ৪৮: ২৬)।

মুসলমান মাত্রই উগ্র, আপোষহীন, কলহমুলক মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করবে। কেননা, এই উগ্র মনোভাব কুরআনের শিক্ষার বিপরীত। এর বদলে মুসলমানরা বন্ধুত্বপূর্ণ, নম্র, সহনশীল, শান্তিপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল মানসিকতাকে গ্রহণ করবে। মুসলমানরা পৃথিবীর মানুষের সামনে নিজেদেরকে সুন্দর উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করবে ; যাতে তাঁদের পরিপক্ক মানসিকতা, ধৈর্য, প্রগতিশীলতা, ভদ্রতা ও শান্তি প্রিয়তার প্রশংসা সবাই করে। মুসলমানরা সর্বোচচ সুন্দর উপায়ে ইসলামের আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাবে। মুসলমানরা পৃথিবীতে ইসলামের প্রতিনিধি। শুধু ভাল আচরণের দিক থেকেই নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই যেমন শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, নান্দনিক সৌন্দর্য ইত্যাদিতে তাঁরা কল্যাণকর অবদান রাখবে।

অন্যদের কাছে ইসলামকে ব্যাখ্যা করা ও অপপ্রচার (অনৈসলামিক মতবাদ যা ইসলামের নামে প্রচলিত রয়েছে সেগুলির) কবল থেকে ইসলামকে মুক্ত করার নৈতিক দায়িত্ব মুসলমানদেরই। অমুসলিমদের প্রতি মুসলমানদের মনোভাব ও আচরণ কেমন হবে, তা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন, “ (হে নবী); তুমি তোমার মালিকের পথে (মানুষদের) জ্ঞান ও সৎ উপদেশ দ্বারা আহ্বান করো, (কখনো তর্কে যেতে হলে) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তি তর্ক করো, যা সবচেয়ে উত্তম উপায়; তোমার মালিক ভাল করেই জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয়ে গিয়েছে, (আবার) যে ব্যক্তি (হেদায়াতের) পথে রয়েছে তিনি তাঁর সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অবহিত আছেন; (সুরা আন নাহল ; ১৬: ১২৫)।

সন্ত্রাসের পদ্ধতি ও মনোস্তত্ত্ব:

সন্ত্রাস বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয় , কাউকে কিছু করতে বাধ্য করার জন্য ভয় দেখানো। প্রায় ক্ষেত্রেই সন্ত্রাস বলতে চরমপন্থী দলগুলির সশস্ত্র আক্রমণকেই বোঝায়। তবে, এখন এর চেয়েও ব্যাপক অর্থে সন্ত্রাস চিহ্নিত হচ্ছে। যে কোন অসহায় , নিরপরাধ মানুষই এখন সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে। অসহায় মানুষরা আতংকের মধ্যে দিন কাটায়। এটাও এক ধরণের সন্ত্রাস। এমনভাবে ভয় দেখানো হয় যাতে মানুষ বাধ্য হয় নির্দিষ্ট কোন চিন্তা ও আচরণ অনুসরণ করতে। ভয় দেখিয়ে কাউকে কিছু করার জন্য বাধ্য করতে যে সন্ত্রাস চালানো হয় , তার শিকার হয় অসহায় নাগরিকরা।

সন্ত্রাসী সংগঠণগুলি সমর্থন আদায়ের জন্যই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করে। তারা হিসাব কষে সন্ত্রাসী আক্রমণের পরিকল্পনা করে যাতে তাদের আদর্শ বাস্তবায়নে কিছু বা সব মানুষের সমর্থন পাওয়া যায়। সাধারণত সন্ত্রাস বলতে মানুষ প্রথমেই ‘ সাম্যবাদী’ বা কমিউনিষ্ট দলগুলির সন্ত্রাসকেই বুঝাতো। তবে এখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এবং একনায়কতন্ত্র রয়েছে যেখানে সে সব দেশে এক ধরনের সন্ত্রাস দেখা যায়। কমিউনিষ্ট দলগুলি যে ধরণের সন্ত্রাসের কৌশল গ্রহণ করে, একনায়করাও সন্ত্রাসের কৌশলকে প্রয়োগ করে। একজন একনায়ক ও তার দল হলো নির্যাতনকারী ; তারা শুধু নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। এই কারণে বিভিন্ন সামাজিক বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মুখোমুখি হয় এরা। তখন এই একনায়করা পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে সন্ত্রাস ও নির্যাতনের আশ্রয় নেয় ; যাতে সবাইকে বোঝানো যায় যে , বিরোধী দল থেকে তারা বেশী শক্তিশালী। সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তারা মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয় এবং নিজেদের ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করে।

সন্ত্রাসী দলগুলি দাবী করে যে , তারা এই সব একনায়ক ও স্বৈরাচারী শাসকদের ক্ষমতা থেকে সরাতে চায়; কেননা এই শাসকরা অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসেছে ও ক্ষমতার অপব্যবহার করছে ; এছাড়া এরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির শাসক। তাই ক্ষমতা থেকে এদের সরালে জনগণের দু:খ কমবে , সংগঠনগুলির আশা পূরণ হবে যে অত্যাচারীর শাসনকাল শেষ হয়েছে । যদিও তাদের এই দাবী সত্যি নয়। যারা এরকম চিন্তা করে, পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারায় আল্লাহ তাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন, ‘ আর যখন তাদের বলা হয় যে, দুনিয়ায় তোমরা অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে , আমরা তো কেবল

শান্তি স্থাপনকারী ; সাবধান, তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী , কিন্তু তার তা বুঝতে পারে না (সুরা বাকারা; ২:১১-১২)।

সন্ত্রাসীদের জন্য মানুষকে খুন করা হলো একটি জীবনব্যবস্থা। তারা বিন্দুমাত্র করুণা না করে নিরপরাধ মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে , বাচ্চাদের উপর বোমা ছুড়তে পারে। রক্ত ঝরানোর মধ্যেই সন্ত্রাসীদের জন্য আনন্দ রয়েছে। তারা নিজেদেরকে আর মানুষের পর্যায়ে রাখে নি; বরং অসভ্য জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ যদি মানুষের প্রতি সামান্য করুণাও দেখাতে চায় , তাহলে সন্ত্রাসীরা তাকে ভীরু, কাপুরুষ , বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিহ্নিত করে এবং অপদস্থ করে। কখনো স্থানীয় দলাদলির কারণে মুল দলের সদস্যরা নিজেরাই একে অন্যের প্রতি বন্দুক তুলে ধরে ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দেখা যাচেছ যে, সন্ত্রাস আর কিছুই না বরং মানুষের রক্ত ঝরানোর একটি নিষ্ঠুর উপায়। যে একে সমর্থন করে সে আসলে একটি অশুভ শয়তানী ব্যবস্থাকে সমর্থন করছে।

যদি কোন সন্ত্রাসী ধর্মের বুলি ও প্রতীক ব্যবহার করে, তবে তা যেন কাউকে প্রতারিত করতে না পারে। যে সব সন্ত্রাসী ধর্মকে ব্যবহার করছে তারা দ্বিগুণ অপরাধী। কেননা, তারা ধর্মের নামে অসহায় মানুষের রক্ত ঝরাচেছ আর অন্যায় কাজে ধর্মকে ব্যবহার করে মুলত: ধর্মবিরোধী প্রচারণাকে জোরদার করতে সাহায্য করছে।

ধর্ম ও সন্ত্রাস একে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সন্ত্রাসের নীতি হলো আগ্রাসন , হত্যা , কলহ , নিষ্ঠুরতা ও দুর্ভোগ। কিন্তু পবিত্র কুরআনের নীতিমালার আলোকে এ সব হলো নির্যাতন। আল্লাহ নির্দেশ দেন শান্তি , একতা , ভাল ইচছা , আপোষ ও সমঝোতা। আল্লাহ সন্ত্রাসকে নিষেধ করেন এবং যে সব কাজ শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বাঁধা সেসবও তিনি নিষেধ করেন। এসব অশান্তির জন্য যারা দায়ী তাদেরকে আল্লাহ নিন্দা করেছেন---‘আর যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় শপথ করার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে , আর পৃথিবীতে অশন্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় , তাদেরই জন্য রয়েছে অভিশাপ ও নিকৃষ্ট পরিণাম (সুরা রাদ, ১৩:২৫)।

সন্ত্রাসী আর তার সমর্থকদের মধ্যে একটি সাধারণ মিল হলো যে , আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা এদের অজানা। এদের মন অত্যন্ত কঠিন এবং এরা আত্মিকভাবে অসুস্থ। কুরআনে আল্লাহ এ মানুষদের সম্পর্কে বলেছেন, ‘ আর তুমি { হযরত মুহাম্মাদ (দ:)} এমন মানুষের অনুসরণ করবে না, যে কথায় কথায় কসম করে, যে হীন প্রকৃতির ; যে মানুষের বদনাম ও

চোগলখুরী করে বেড়ায় ; যে নেক কাজে বাঁধা দেয় , যে সীমা লংঘনকারী , যে মহাপাপী , যে রুক্ষ স্বভাব ও কুখ্যাত ’(সুরা কালাম, ৬৮:১০-১৩)।

অর্থহীন বিদ্রোহ আর অন্যায় কাজকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। বর্তমান সময়ে আমরা যে সন্ত্রাস আর অরাজকতা দেখি তা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে , ‘ বলো , আমার রব হারাম করেছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা , পাপ কাজ , অসংগত বিরোধীতা , আল্লাহ’র সাথে এমন কিছু শরীক করা যার কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেন নি এবং আল্লাহ’র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জানো না (সুরা আরাফ , ৭:৩৩)।

সন্ত্রাস: সন্ত্রাসীদের অপপ্রচারের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ হাতিয়ার

সন্ত্রাসীরা নিজ দলের পক্ষে প্রচার চালাতে সন্ত্রাসকে একটি কৌশল হিসাবে বিবেচনা করে। নিরপরাধ মানুষকে খুন করলে , ব্যাংক ডাকাতি করলে , কাউকে জিম্মী করলে বা বোমা মারলে তাদের দলের নাম ও তারা কোন আদর্শে বিশ্বাসী সেসবের প্রচার হয়। লক্ষ, কোটি বুকলেট বা প্রচারপত্র ছাপালে যেটুকু পরিচিতি তারা লাভ করে , তার থেকে অনেক গুণ বেশী প্রচার তারা পায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করে মাত্র একদিনে ।

কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষ যার মধ্যে সহানুভূতি , ক্ষমা , ধৈর্য এবং সংহতিবোধ রয়েছে , তার কাছে সন্ত্রাসীদের এই মনোভাব অচেনা মনে হবে। কুরআনের শিক্ষার সাথেও সন্ত্রাসীদের এই আচরণের কোন মিল নেই। যে সমাজে ধর্ম -বিরোধী আদর্শের প্রভাব রয়েছে, সেখানেই কেবল এই ধরণের অনৈতিক মানসিকতা ও কাজের সমর্থন লাভ করা সম্ভব। তাই এ ধরণের অশুভ শক্তি ও অন্যায় থেকে মানুষকে রক্ষার একমাত্র উপায় হলো কুরআনের শিক্ষাকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা।

আসমানী কিতাবের মানুষদের প্রতি কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গী:

আমেরিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস নিয়ে কথা বলার সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় স্থান পায়; তাহলো পশ্চিমা বিশ্ব ও ইসলামিক বা মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক। নব্বইয়ের দশকে কিছু বুদ্ধিজীবী মত প্রকাশ করেন যে ইসলাম ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে একটি উদ্যোগ গ্রহণ বিশ্ববাসীর পাওনা হয়ে আছে। এটাই হলো স্যামুয়েল হান্টিংসের বিখ্যাত গবেণামুলক প্রবন্ধ ‘ The Clash of Civilisation’ বা সভ্যতার সংঘর্ষের মূল বিষয়। তবে বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাবিদ এডওয়ার্ড সাঈদ যেমনটি বলেছেন একে বরং ‘ অজ্ঞতার সংঘর্ষ ’ বলাই ভাল। এই অজ্ঞতা একটি কাল্পনিক চিত্রনাট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যার জন্ম হয়েছে এই দুই বিশ্বের কিছু চরমপন্থী ও অজ্ঞ দলগুলির বাড়াবাড়ির কারণে। এদের ধর্মবিরোধী আচরণকে অতিরঞ্জিত করে এই ভূল মতবাদটি প্রচার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে , পশ্চিমা ও ইসলামী বিশ্বের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হতে পারে না। কেননা, ইয়াহূদী ও খৃস্ট ধর্মের মূল বিশ্বাস এবং পশ্চিমা সভ্যতা যে মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত , সেসব ইসলামের সাথে সুন্দরভাবে খাপ খায়।

কুরআনে ইয়াহূদী ও খৃস্টান দের ‘‘ *আসমানী কিতাবের মানুষ* ’’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এদের কাছে আল্লাহ’র কাছ থেকে পবিত্র কিতাব এসেছে । তাই এদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী যথার্থ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন। আসমানী কিতাবের মানুষদের প্রতি এই ন্যায়ের মনোভাব গড়ে উঠে ইসলামের প্রতিষ্ঠার বছরগুলিতে। ইসলামের জন্মলগ্নে মুসলিমরা ছিল সংখ্যালঘু; তাঁরা নিজেদের বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে সংগ্রাম করছিল। মক্কার পৌত্তলিকদের দ্বারা মুসলিমরা নানা অত্যাচারের শিকার হয়। এই নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে কিছু মুসলমান মক্কা ছেড়ে দুর দেশে কোন ন্যায়-পরায়ন শাসকের অধীনে চলে যেতে মনস্থ করে। হযরত মুহাম্মাদ (দ:) তাঁদেরকে ইথিওপিয়ার খৃস্টান শাসকের রাজ্যে আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন। যে সব মুসলিম ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন , তাঁরা সেখানকার শাসনব্যবস্থাকে অত্যন্ত সনশীল ও যথার্থ হিসাবে পায়। মুসলিমদেরকে সেখানে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে গ্রহণ করা হয়।

মক্কার পৌত্তলিকরা এই খৃস্টান শাসকের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় যেন তিনি মক্কা থেকে পালিয়ে আসা মুসলিমদের এই দলের কাছে হস্তান্তর করেন। খৃস্টান রাজা পৌত্তলিকদের এই দাবী অগ্রাহ্য করেন এবং ঘোষণা করেন যে মুসলিমরা স্বাধীনভাবে তাঁর রাজ্যে থাকতে পারবে। খৃস্টানদের এই সহানুভূতি , দয়া ও ন্যায়-পরায়নতার মনোভাবকে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে , ‘......আর মানুষের মধ্যে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্বে বেশী কাছে পাবে যারা বলে –আমরা তো নাসারা (খৃস্টান)। কারণ , তাঁদের মধ্যে আছে

অনেক আলেম ও সংসার– বিরাগী দরবেশ। আর তাঁরা অহংকারও করে না’ (সুরা মায়িদা, ৫: ৮২)।

মুসলমান ও আসমানী কিতাবের মানুষদের মধ্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মিল:

বিভিন্ন দিক বিচার করে বলা যায় , খৃস্টান ও মুসলমানদের বিশ্বাসের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। ইয়াহুদী দের অনেক ধমীয় বিশ্বাসও ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । কুরআনে বলা হয়েছে মুসলিমদের মতো আসমানী কিতাবের মানুষেরাও একই বিশ্বাস রাখে । আল্লাহ কুরআনে নির্দেশ দেন ,‘তোমরা যুক্তিসঙ্গত উত্তম পদ্ধতি ছাড়া কিতাবীদের সাথে তর্ক করবে না , তবে তাঁদের মধ্যে যারা সীমা লংঘনকারী তাদের সাথে করতে পারো এবং বলো , আমরা ঈমান রাখি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও; আর আমাদের মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ তো একই এবং আমরা তো তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পনকারী ’(সুরা আনকাবুত, ২৯: ৪৬)।

এই তিন মহান ধর্মের প্রকৃত অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে :

––স্রষ্টা এই পুরো মহাবিশ্বকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সব কিছুর নিয়ন্ত্রক এবং সর্বশক্তিমান;
–––স্রষ্টা মানুষকে ও সব প্রাণীকে অলৌকিকভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ তাঁর স্রষ্টার কাছ থেকে আত্মা লাভ করেছে ;
–––মৃত্যু পরবতী জীবন , বেহেশত ও দোযখ , ফেরেশতায় এরা বিশ্বাসী। স্রষ্টা নির্দিষ্ট নিয়তি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ।
––––যীশু খৃস্ট বা হযরত ঈসা (আ:) , হযরত মুহাম্মাদ (দ:) ছাড়াও স্রষ্টা আরো অনেক নবী ও রাসুল (দ:) পাঠিয়েছেন। যেমন, হযরত নূহ (আ:), হযরত ইবরাহীম (আ:), হযরত ইসহাক (আ:), হযরত ইউসুফ (আ:) । প্রকৃত ধার্মিকরা স্রষ্টার পাঠানো এই সব নবীদেরকেই ভালবাসেন ।

মুসলমানরা নবীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। এই বিষয়টি কুরআনে এসেছে এভাবে, ‘ রাসুল ঈমান এনেছেন ঐ সব বিষয়ের উপর যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে এবং মুমিনরাও ঈমান এনেছে। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহ’র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি , তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসুলদের প্রতি। তারা

বলে , আমরা আল্লাহ’র রাসুলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। তাঁরা আরো বলে: আমরা শুনেছি এবং মান্য করেছি। হে আমাদের পরওয়ারদেগার। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আর আপনার কাছেই তো ফিরে যেতে হবে (সুরা বাকারা , ২: ২৮৫)।

আসমানী কিতাবের মানুষদের বিশ্বাস মুসলমানদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ; এটা শুধুমাত্র ধর্মীয় মুল্যবোধের ক্ষেত্রেই নয়, বরং নৈতিকতার দিক থেকেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমানে অনৈতিক বিভিন্ন বিষয় যেমন ব্যভিচার বা পরকীয়া প্রেম , সমকামিতা, ড্রাগসের নেশা এবং অহংবোধ ও আত্নকেন্দ্রিকতা , নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। আসমানী কিতাবের মানুষ ও মুসলমানরা একই মূল্যবোধে বিশ্বাসী; যেমন, সম্মান , পবিত্রতা, মানবিকতা , আত্নত্যাগ , সততা, সহানুভূতি , ক্ষমা ও শর্তহীন ভালবাসা।

বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ধর্মবিরোধী শক্তিগুলির একজোট হওয়া:

নাস্তিক আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ বিশ্বাসগুলি বর্তমানে বিশ্বে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি খৃস্ট , ইয়াহূদী ও ইসলাম ধর্মের মানুষদেরকে পরস্পরের কাছে এনেছে। বিশ্বে অত্যন্ত সুপরিচিত ও ক্ষতিকর ধর্মবিশ্বাসী মতবাদগুলির মধ্যে অন্যতম হলো;– ভোগবাদিতা, তথাকথিত সাম্যবাদিতা , ফ্যাসিবাদ (সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ বিরোধী মত), নৈরাজ্যবাদ , বর্ণ–বৈষম্য , নাইহিলিজম (সন্ত্রাসবাদ বা প্রচন্ড বিপ্লববাদ; বর্তমান সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসকামী) ও মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক মতে বিশ্বাসী ।

অনেক মানুষ যারা মহাবিশ্বের সৃষ্টি , মানুষের ও সমাজের সৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন মিথ্যা মতবাদ , প্রতারণামূলক ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় বিশ্বাস করেছে , তারা নিজেদের ধর্মে হয় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে অথবা সন্দেহ পোষণ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা , এই সব ভ্রান্ত মতবাদগুলি মানুষ, সমাজ ও জাতিগুলিকে বিরাট এক বিপদ, দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ–বিগ্রহের মধ্যে টেনে এনেছে। এতে মানবতার যে ক্ষতি হয়েছে , মানুষ যে দু:খ, কষ্ট–যন্ত্রণা ভোগ করেছে , সেটার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই সবগুলি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর–––––ইংল্যান্ডের জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের

বিবর্তনবাদ। এই সব মতবাদে বিশ্বাসী নাস্তিকরা স্র্ষ্টা ও স্রষ্টার সৃষ্টিকে অস্বীকার করে।

নাস্তিকতার আদর্শের উপর ভিত্তি করে ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই তত্ত্বে দাবী করা হয়েছে প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে আকস্মিকভাবে এবং জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে। তাই, ডারউইন এর তত্ত্ব মানুষের কাছে এই ভুল বার্তা পাঠায় যে: তুমি তোমার জন্মের জন্য কারো কাছে কৃতজ্ঞ নও। তুমি আকস্মিকতার কাছেই ঋণী। তোমাকে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হবে এবং দরকার পড়লে অন্যের উপর অত্যাচার করে , তাকে দমিয়ে হলেও তোমাকে সাফল্য লাভ করতে হবে। এই পৃথিবী হলো সংগ্রাম ও নিজ স্বার্থের জায়গা। ’’

ডারউইনের তত্ত্ব থেকে যে সব সামাজিক মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, সেসব হলো : প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) , জীবন সংগ্রাম (struggle for life) , যে যোগ্য সেই টিঁকে থাকবে(survival of the fittest) ইত্যাদি। এসব হলো মানুষকে এক বিশেষ মতবাদে শিক্ষা দেয়া। এইসব শয়তানী নীতি ও আদর্শ মানুষকে উপদেশ দেয় অহংবোধে আক্রান্ত হতে এবং আত্মকেন্দ্রিক , নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী হয়ে যেতে। এটা ক্ষমা , সহানুভূতি , আত্মত্যাগ ও মানবিকতা এবং তিনটি মহা ধর্মের উচচ নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে। নাস্তিকতা , স্বার্থপরতাকে জীবনের অপরিহার্য নীতি হিসাবে এইসব মতবাদ উপস্থাপন করে।

ডারউইনের এই বিশেষ মতবাদ হলো আসমানী কিতাবের মানুষ ও কুরআনের বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর ফলে , এই ভ্রান্ত মত এমন এক বিশ্বের প্রতিষ্ঠা করে যা তিনটি পবিত্র ধর্মের বিরোধী্ এ কারণে , আসমানী কিতাবের মানুষ ও মুসলমানদের জন্য এটা অপরিহার্য কর্তব্য যে তারা পরস্পরকে এই মতবাদের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করবে। কেননা, এই তিন ধর্মের মানুষেরাই স্রষ্টায় বিশ্বাসী ও স্রষ্টার আদেশ ও নির্দেশের প্রেক্ষিতে যেসব ধর্মীয় মূল্যবোধ পবিত্র গ্রন্থগুলি শিক্ষা দেয় তাতে বিশ্বাসী্ এই তিন ধর্মের অনুসারীরা বিশ্ববাসীর কাছে ডারউইনের মতবাদের ভূল দিকগুলি তুলে ধরবে; এই মতের যে কোন প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তবুও কিছু মানুষ নিজেদের ভোগবাদী মানসিকতার স্বার্থে এই মতবাদকে রক্ষা করতে হবে। এই তিন ধর্মের মানুষদের সম্মিলিতভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম করতে হবে সব ধরণের ভ্রান্ত

ধারণা ও মতবাদ (যেমন সাম্যবাদ , ফ্যাসীবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ) যা নাস্তিকতাকে উদ্বুদ্ধ করে। এটা যখন সবাই বুঝতে পারবে , তখন পৃথিবীর মানুষ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শান্তি, বন্ধুত্ব ও ন্যায়পরায়নতাকে গ্রহণ করবে।

ইয়াহুদী বিদ্বেষ বা জাতিগত বিদ্বেষ ইসলাম বিরোধী:-

জাতিগত বিদ্বেষ এমন একটি মতবাদ যা বিশ্ব শান্তির পক্ষে হুমকি। এটা নিরপরাধ মানুষের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। জাতিগত বিদ্বেষের কারণে অনেকেই ইয়াহুদীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে।

বিংশ শতাব্দীতে ইয়াহুদী বিদ্বেষ বিরাট এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। জার্মানীর নাৎসীরা ইয়াহুদী দের উপর বিশ্বের অন্যতম নিষ্ঠুর অত্যাচার ও হত্যাকান্ড চালায়। এছাড়াও, অন্য অনেক দেশেও ইয়াহুদীদেরকে টার্গেট করা হয় এবং নানা অত্যাচার তাদের উপর চালানো হয়। ফ্যাসিবাদী দলগুলি ইয়াহুদীদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করে এবং তাদের রক্ত ঝরায়।

কুরআনের নীতিমালার আলোকে মুসলিম , ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা অবশ্যই মিত্রতা বজায় রেখে বসবাস করবে :

পবিত্র কুরআনের আলোকে আসমানী কিতাবের মানুষ ও স্রষ্টায় অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । সামাজিক জীবনে এই পার্থক্যের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন, যারা আল্লাহ’র সাথে অন্য উপাস্যকে শরীক করে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে , “..... মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এই বৎসরের পর মসজিদে হারামের কাছে না আসে .....” (সুরা তওবা, ৯:২৮)। যারা আল্লাহকে শরীক করে, তারা পবিত্র ধর্মীয় আইন সম্পর্কে কিছুই জানে না; তাদের কোন নৈতিক শিক্ষা নেই ; এবং এরা যে কোন ধরণের নীচ ও বিকৃত আচরণ কোনরকম দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই করতে পারবে।

কিন্তু আসমানী কিতাবীরা যারা প্রধানত: আল্লাহ’র বাণীর উপর বিশ্বাস রাখে ; তাঁদের নৈতিক ও ধর্মীয় জ্ঞান আছে ; তাঁরা জানে কোনটা বৈধ , কোনটা অবৈধ । আসমানী কিতাবের অনুসারী নারীদেরকে বিয়ে করতে মুসলিম পুরুষদের অনুমতি দেয়া হয়েছে । আল্লাহ বলেছেন , “আজ তোমাদের জন্য সব ভাল জিনিস হালাল করা হলো ; যাদের উপর আল্লাহ’র কিতাব নাযিল করা হয়েছে , তাদের খাবারও তোমাদের হালাল আবার তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল; মুমিন সৎ চরিত্রের নারী ও তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাঁদের সৎ চরিত্রের নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো যদি তোমরা তাদের দেনমোহর দাও বিয়ের জন্য , প্রকাশ্য ব্যভিচার বা গোপন অভিসারী (উপপত্নী) বানিয়ে নয়; যে কেউই ঈমানকে অস্বীকার করবে , তার (জীবনের) সব কর্মই নিস্ফল হয়ে যাবে এবং শেষ বিচারের দিনে সে হবে (চরমভাবে) ক্ষতিগ্রস্থদের একজন ’(সুরা আল মায়িদা, ৫: ৫)। এই আদেশগুলি এটাই বোঝাচ্ছে যে , বিয়ের মাধ্যমে আসমানী কিতাবীদের সাথে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং দু’পক্ষই পরস্পরের খাওয়ার দাওয়াত কবুল করতে পারবে। এসব হলো ধর্মের মুল ব্যপার যা একটি সুখী সাম্প্রদায়িক জীবন ও ন্যায়সঙ্গত মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত করে। যেহেতু পবিত্র কূরআন ন্যায়সঙ্গত ও সহনশীল আচরণের নির্দেশ দেয় , তাই এটা চিন্তাও করা যায় না যে কোন মুসলিম এর বিপরীত মত গ্রহণ করবে। আসমানী কিতাবের মানুষদের প্রতি হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর ন্যায় ও সহনশীল আচরণ মুসলমানদের জন্য একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। আরবের দক্ষিণে নাজারান এলাকার খৃস্টানদের সাথে হযরত মুহাম্মাদ (দ:) যে চুক্তি করেছিলেন তার মাধ্যমে তিনি সহনশীলতা ও ন্যায়পরায়নতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্থাপন করেছেন। চুক্তিতে নীচের ধারাগুলি অন্তর্ভূক্ত ছিল:

নাজারান ও তার চারপাশের এলাকার মানুষের জীবন , তাদের ধর্ম , জমি , সম্পত্তি , গৃহপালিত গরু-ছাগল ও যারা এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত তাদের নবী , রাসূলগণ এবং উপাসনালয় আল্লাহ’র হেফাজতে ও আল্লাহ’র রাসূলের তত্ত্বাবধানে থাকবে (২০)।

এই ধরণের চুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ’র রাসূল (দ:) মুসলমান ও আসমানী কিতাবীদের জন্য সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। এই আদেশ পবিত্র কূরআনের সুরা বাকারার ৬২ নং আয়াতের লিখিত বাস্তবায়ন .....‘ যারা ঈমান আনে , তারা খৃস্টান হোক ইয়াহুদী হোক কিংবা সাবী হোক যে কেউই আল্লাহ’র উপর ঈমান আনবে, ঈমান আনবে পরকালের উপর এবং যথার্থ ভাল কাজ করবে , আল্লাহতালা তাঁদের

অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন এবং এসব লোকের কোন ভয় নেই, তেমনি তারা চিন্তিতও হবে না’ (সুরা আল বাকারা ২: ৬২)। ইয়াহুদী , খৃস্টান ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে ন্যায়-বিচার ও সহনশীলতা নিশ্চিত করতে মদীনা সংবিধান ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আজ থেকে ১৪০০ শত বছর আগে ৬২২ খৃস্টাব্দে হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর নেতৃত্বে মদীনায় সংবিধান লিখিত হয়। বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের প্রয়োজন মেটাতে ও লিখিত চুক্তির রীতি চালু করার জন্য মদীনা চুক্তি করা হয়। বিভিন্ন ধর্মের ও জাতির দল ও গোষ্ঠী যারা ১২০ বছর ধরে পরস্পরের শত্রুতায় মেতে ছিল , তারা এই বৈধ চুক্তির আওতায় একে অপরের অংশীদার হলো। এই চুক্তির মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (দ:) দেখালেন যে , যারা দীর্ঘকাল একে অপরের শত্রু ছিল এবং কোন ধরণের সমঝোতায় আসতে পারছিল না, তাদের পক্ষেও ঝগড়ার সমাপ্তি ঘটিয়ে একই সমাজে পাশাপাশি বাস করা সম্ভব।

মদীনা সনদ্ অনুযায়ী প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে যে কোন বিশ্বাস ও ধর্ম , রাজনৈতিক ও আদর্শগত মতকে বেছে নিতে পারতো । একই মতে বিশ্বাসী মানুষেরা একত্রে মিলেমিশে একটি দল বানাতে পারতো। প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজেদের বিচার-ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটাতে পারতো। অবশ্য , কেউ কোন অন্যায় করলে তাকে কেউ শাস্তি থেকে রক্ষা করার অপচেষ্টা করবে না। চুক্তির আওতাধীন দলগুলি একে অন্যকে সহযোগিতা করবে , পরস্পরকে সমর্থন দেবে এবং হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর নিরাপত্তা হেফাজতে থাকবে। এই চুক্তিটি কার্যকর ছিল ৬২২ খ্রী: থেকে ৬৩২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এই চুক্তির মাধ্যমে রক্ত ও আত্মীয়তার সূবাদে গড়ে উঠা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত সামাজিক কাঠামোর অবসান ঘটে; এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও ভৌগলিক পটভূমির মানুষেরা কাছাকাছি আসে ও একটি সামাজিক বন্ধন গড়ে তুলে । মদীনা সনদ্ পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিল।

মঠ , গির্জা ও সীনাগগ (ইয়াহুদীদের ধর্মমন্দির)গুলিকে সম্মান দেখাতে হবে:

পবিত্র কুরআন থেকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই যে, মুসলমানরা অবশ্যই ইয়াহুদী ও খৃস্টান দের উপাসনাগুলিকে সম্মান প্রদর্শন করবে। কুরআনে আসমানী কিতাবের মানুষদের উপাসনালয়গুলি যেমন মঠ, গির্জা , সীনাগগকে বলা হয়েছে আল্লাহ’র রক্ষণাবেক্ষণে থাকা প্রার্থনালয় “ ......যদি আল্লাহ মানব জাতির এক দলকে আরেক দল দিয়ে প্রতিহত না

করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (খৃস্টান সন্ন্যাসীদের) উপাসনালয় ও গির্জাসমুহ ধ্বংস হয়ে যেত (ধ্বংস হয়ে যেত ইয়াহুদী দের) ইবাদতের স্থান ও (মুসলমানদের) মসজিদসমূহও যেখানে বেশী বেশী পরিমাণে আল্লাহতালার নাম নেয়া হয়; আল্লাহতালা অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে (আল্লাহতালার) দীনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে , অবশ্যই আল্লাহতালা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী (সুরা আল হাজ্জ , ২২:৪০)।

এই আয়াত মুসলমানদেরকে বোঝাচ্ছে যে , আসমানী কিতাবের মানুষদের পবিত্র স্থানগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শণ ও এসবের রক্ষণাবেক্ষনের গুরুত্ব কত। অবশ্যই হযরত মুহাম্মাদ (দ:) আসমানী কিতাবীদের ছাড়াও স্থানীয় মানুষদের সাথেও চুক্তি করেছিলেন। স্থানীয়দের সাথে সবসময়ই ন্যায় আচরণ করা হতো। তারা যখন নিরাপত্তা চুক্তির আওতায় আসতে চাইলো , তখন তাদের অনুরোধ হযরত নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায়গুলি হযরত (দ:) এর কাছ থেকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা চেয়েছিল যখন তারা কোন আক্রমণের আশংকা করছিল অথবা অন্যায়ভাবে কোন অপবাদের শিকার হয়েছিল।

হযরত মুহাম্মাদ (দ:) যতদিন বেঁচে ছিলেন , ততদিন অনেক অমুসলিম ও স্থানীয় জনগণ রাসূল (দ:)এর কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল। তিনি তাদেরকে নিজ হেফাজতে আনেন ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। স্থানীয় অমুসলিমরা আশ্রয় চাইলে বিশ্বাসীরা যেন তাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করে , এই মর্মে আল্লাহ সুরা তওবায় উপদেশ দিয়েছেন , “ আর মুশরিকদের মধ্যে থেকে যদি কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায় , তবে অবশ্যই তাকে তুমি আশ্রয় দেবে , যাতে করে (তোমার আশ্রয়ে থেকে) সে আল্লাহতালার বাণী শুনতে পায় , তারপর তাকে তার (কোন) নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিবে.......... (সুরা আত-তাওবা, ৯:৬)।

যারা স্রষ্টায় আদৌ বিশ্বাস করে না , তাদের চেয়ে ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা মুসলমানদের বেশী কাছের; কেননা এই তিন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কিছু সাধারণ মিল রয়েছে । এই তিন ধর্মের অনুসারীদেরই রয়েছে নিজস্ব পবিত্র ধমীয় গ্রন্থ অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত আসমানী কিতাব। তারা জানে কোনটা ঠিক , কোনটা ভুল। কোন কাজ তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুসারে বৈধ , কোনটা অবৈধ আর তারা আল্লাহ’র নবী ও রাসূলদের (দ:)

কে শ্রদ্ধা করে। এরা সবাই মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে স্রষ্টার সামনে এই দুনিয়ার জীবনের সব কাজের জন্য দায়ী হতে হবে। এই সব ভিত্তির উপর আমরা এক হতে পারি।

তিন ধর্মের মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য একটি মতের উপর ভিত্তি করে একত্রে উজ্জীবিত হওয়া :

আসমানী কিতাবীদের ব্যপারে আল্লাহ মুসলমানদেরকে কূরআনে নির্দেশ দিয়েছেন যে : “ (হে নবী) যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি , (তাদের) তুমি বলো , এসো , (একমত হই) ---যা আমাদের কাছে এক (ও অভিন্ন এবং তা হচ্ছে) , আমরা এক স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবো না এবং অন্য কাউকে স্রষ্টার অংশীদার বানাবো না ; এক স্রষ্টা ছাড়া আমরা নিজেদেরকেও একে অপরের প্রভু বলে মেনে নেবো না’.......(সুরা আল ইমরান, ৩:৬৪)।

ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের কাছে এটা অবশ্যই আমাদের আহ্বান : আমরা যারা স্রষ্টায় বিশ্বাসী ও তাঁর পাঠানো ঐশী বাণীর অনুসারী , চলুন আমরা একটি সাধারণ বিষয়ে এক হই; তাহলো বিশ্বাস । আসুন , আমরা আল্লাহকে ভালবাসি ও তাঁর নির্দেশ মেনে চলি যিনি আমাদের স্রষ্টা ও প্রভু। আসুন, আমরা এক সাথে দোয়া করি যেন আল্লাহ আমাদেরকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করেন। যখন মুসলমান, খৃস্টান ও ইয়াহূদীরা এভাবে একটি সাধারণ সুত্রে উজ্জীবিত হবে , যখন তারা বুঝতে পারবে যে তারা একে অন্যের বন্ধু ----শত্রু না ; যখন তারা বুঝতে পারবে যে সত্যিকারের শত্রু হলো স্রষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করা , তখন এই পৃথিবী হয়ে যাবে সম্পূর্ণ অন্যরকম । বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যে যুদ্ধ , শত্রুতা , ভয় , আতংক ও সন্ত্রাসী আক্রমণ ঘটছে তার সমাপ্তি ঘটবে ; এবং এই সাধারণ সুত্রের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন সভ্যতার জন্ম হবে যার মুলে থাকবে ভালবাসা , শ্রদ্ধা ও শান্তি।

এসব হলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা মুসলমানদেরকে বিবেচনায় আনতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে অন্য মত ও বিশ্বাসের মানুষদের সম্পর্কে কূরআনে কী শিক্ষা দিয়েছেন , তা একদম স্পষ্ট। কূরআনের নীতিমালা জাতিগত ঘৃণা ও বিদ্বেষের উর্ধ্বে। এতে বলা হয়েছে , যতক্ষণ পর্যন্ত অমুসলিমরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি সহনশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে।

এটা পরিষ্কার যে , ইয়াহূদী রা অনেক ভুল করেছে যার উল্লেখ ও সমালোচনা কুরআনে করা হয়েছে এবং এসব ভুলের ব্যপারে সতর্ক করা হয়েছে।

বর্তমানে ইসরাইল মানবতার বিরুদ্ধে যা অপরাধ করছে তা দু:খজনক ও সর্বজনবিদিত কিন্তু এজন্য মুসলমানরা অবশ্যই সব ইয়াহূদীকে শত্রু ভাববে না। কুরআনের একটি ইতিবাচক শিক্ষা এই যে , কোন মানুষের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না শুধুমাত্র এই কারণে যে সে নির্দিষ্ট কোন গোত্র , জাতি বা ধর্মের। সব সমাজেই ভাল মানুষ যেমন আছে তেমনি খারাপ মানুষও আছে। পবিত্র কুরআন এই পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় , আল্লাহ ও তাঁর ধর্মের বিরুদ্ধে আসমানী কিতাবীদের কারো কারো বিদ্রোহ করার কথা উল্লেখের পরপরই যারা ব্যতিক্রম তাঁদের কথা বলা হয়েছে “ যারা আহলে কিতাব তারা (আবার) সবাই এক রকম নয় , এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে , যারা সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; এরা রাতের বেলায় সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ’র কেতাব পাঠ করে , এরা আল্লাহতালা ও শেষ বিচার দিনের উপর ঈমান রাখে (এবং মানুষদের) এরা ন্যায় কাজের আদেশ দেয় ও অন্যায় কাজে নিষেধ করে। সৎ কাজে এরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে। এ (ধরনের) মানুষরাই হচ্ছে মুলত: নেক লোকদের অন্তর্ভূক্ত; তারা যা কিছু ভাল কাজ করবে (প্রতিদান দেয়ার সময়) তা থেকে কখনো অস্বীকার করা হবে না , কারণ আল্লাহতালা ভাল করেই জানেন কোন ব্যক্তি আল্লাহতালাকে কতটুকু ভয় করে (সুরা ইমরান, ৩:১১৩-১১৫)। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন , “ আমি অবশ্যই প্রত্যেকটি জাতির কাছে রাসুল পাঠিয়েছি , যাতে করে (তাদের কাছে সে বলতে পারে যে ,) তোমরা এক আল্লাহতালার ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো , সে জাতির মধ্যে অত:পর আল্লাহতালা কিছু লোককে হেদায়াত দান করেন আর কিছু লোকের উপর গোমরাহী চেপে বসে ; অতএব তোমরা (আল্লাহতালার) পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো যারা (রাসূলদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিল (সুরা আন নাহল , ১৬: ৩৬)।

আল্লাহ তাঁর সব নবীদের (দ:) কাছেই এটা প্রকাশ করেছেন যে , স্রষ্টা এক ও অনন্য। এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ

ইবাদতের যোগ্য নয়। তাই মানুষ কেবল আল্লাহ’রই ইবাদত করবে, আনুগত্য করবে ও আল্লাহ’র সব হুকুম মেনে চলবে। মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই আল্লাহ এই ঐশী বাণী নবীদের (দ:) মাধ্যমে , মানবজাতির কাছে পোঁছে দিয়েছেন। কিছু সমাজ এই এই ঐশী বাণীকে গ্রহণ করে এবং সত্য–সহজ পথকে অনুসরণ করে; আবার অনেকেই এই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ’র পাঠানো এই বাণী থেকে নিজেদেরকে দুরে রাখে। এই অবস্থা এখনো চলছে।

কিছু মানুষ সত্য–সহজ পথে যারা আছে , তাদেরকে সমর্থন দেবে আবার কেউ কেউ যারা অপরাধের জগতে ডুবে আছে তাদের পক্ষ অবলম্বন করে। এটা আল্লাহ’র আইন ; যারা বিশ্বাসী তারা অবশ্যই এই মত গ্রহণ করবে এবং কখনোই ভুলবে না যে , সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই কিছু মানুষ আছে যারা আন্তরিক , ধার্মিক এবং স্রষ্টাকে ভয় করে চলে।

আবার কিছু মানুষ সব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই আছে যারা ধমীয় আদর্শ থেকে অনেক দুরে থাকে। আমাদের আশা এই যে, এমন এক পৃথিবী গড়ে উঠবে যেখানে মানুষ এক সাথে শান্তিতে থাকতে পারবে; কে কোন মত ও ধর্মে বিশ্বাসী তাতে কিছু যায় আসবে না। সব ধরণের বর্ণ–বিদ্বেষী বিকারকে প্রত্যাখ্যান করা হবে; সবার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে ও সবাই প্রাপ্য সম্মান পাবে। সব ধরণের ধর্ম–বিরোধী মতবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে সংগ্রাম করতে হবে।

এতে আশা করা যায় , দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আল্লাহ এনিয়ে কূরআনে বলেছেন , “ যারা কুফরী করেছে , তারা একে অন্যের বন্ধু , তোমরা যদি (একে অন্যকে সাহায্য করার) সে কাজটি না করো, তাহলে আল্লাহতালার এ জমীনে ফেতনা–ফ্যাসাদ ও বড় ধরণের বিপর্যয় সৃষ্টি হবে (সুরা আনফাল, ৮: ৭৩) ;

“ যেসব উম্মতের লোকেরা তোমাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে , তাদের মধ্যে খুব কমজনই (মানুষকে) জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করতো। আর অত্যাচারীরা তো যে (বৈষয়িক) প্রাচুর্য ছিল তার পেছনেই পড়ে থেকেছে ; তারা ছিল (আসলেই অপরাধী) (সুরা ইউসুফ , ১১:১১৬)।

ইসলাম মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও ঐক্য এনেছিল:

ইতিহাস সাক্ষী , মুসলিম শাসকেরা যখন কূরআনের আদর্শকে মেনে চলেছিল , তখন তাঁদের সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে সবসময় শান্তি , ন্যায়-বিচার ও সহনশীলতা বজায় ছিল । হযরত মুহাম্মাদ (দ:) যখন বেঁচে ছিলেন , তখন এই এলাকায় যে সব নিয়ম-নীতি মেনে চলা হয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ ।
সু- শাসকরাই হযরত (দ:) এর উত্তরাধিকারী হন যারা আল্লাহ’র রাসূল (দ:) এর দৃষ্টান্ত মেনে চলেছিলেন এবং কখনোই কূরআনের শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার নীতি ও আদর্শ থেকে সরে যান নি। এই সব শাসকদের সময়ে ন্যায়বিচার , সঠিক আচরণ ও সততা যা কূরআনে বলা হয়েছে তার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছিল । এসব উদাহরণ পরবতী বংশধরদের জন্য আদর্শ ।

ফিলিস্তিন ও তার রাজধানী জেরুসালেমে তিন পবিত্র ধর্মের মানুষেরা একসাথে বসবাস করেছে । এই ঘটনা এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এটা প্রমাণ করে মুসলমানরা নিজেদের শাসনামলে কিভাবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা এই পবিত্র ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেছিল । অবশ্যই , মুসলিম শাসন গত ১৪০০ বছরের অধিকাংশ সময়ে জেরুসালেম ও ফিলিস্তিনে শান্তি এনেছিল।

খলিফা ওমর (রা:) ফিলিস্তিনে শান্তি ও ন্যায়-বিচার নিয়ে এসেছিলেন:

৭১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জেরুসালেম ছিল ইয়াহূদীদের রাজধানী। ঐ বৎসর রোমান বাহিনী ইয়াহূদী দের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায় এবং অত্যন্ত নৃশংসতার সাথে তাদেরকে ঐ স্থান থেকে বিতাড়িত করে। এ সময় , জেরুসালেম ও আশপাশের জায়গা পরিত্যক্ত এলাকায় পরিণত হয়। অবশ্য,রোমান সম্রাট কনসটেনটাইনের সময় খৃস্ট ধর্ম এই এলাকায় প্রসার পায় ও জেরুসালেম আরো একবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে আসে। এ সময় রোমানরা জেরুসালেমে একাধিক গির্জা বানায়। এই এলাকায় ইয়াহূদীদের বসতি স্থাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। সপ্তম শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ফিলিস্তিন রোমান (বাইজেনটাইন) সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। অল্প কিছুদিনের জন্য এই এলাকায় পারসিয়ানরা জয় করে নেয় কিন্তু বাইজেনটাইনরা আবার এটা জয় করে নেয়। ফিলিস্তিনের ইতিহাসে একটি গুরত্বপূর্ণ ক্রান্তিলগ্ন উপস্থিত হয় ৬৩৭ সালে , যখন ইসলামের সৈনিকরা এই এলাকা জয় করে। যে ফিলিস্তিন শত শত বছর ধরে যুদ্ধ, নির্বাসন , লুট ও গণহত্যা এবং

প্রতিবার ক্ষমতা বদলের সময় নূতন নূতন নৃশংসতা দেখেছে ; সে এবার শান্তি ও ঐক্য দেখলো ।

ইসলামের আবির্ভাব এক নূতন যুগের সূচনা করলো যেখানে বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষেরা শান্তি ও ঐক্যের মধ্যে বাস করতে পেরেছিল। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রাঃ) ফিলিস্তিন জয় করেন। তিনি জেরুসালেমে ঢুকে ভিন্ন মতের মানুষদের প্রতি যে সহনশীলতা, পরিপক্কতা ও দয়া দেখান , তা একটি চমৎকার সময়ের সূচনা করে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কারেন আর্মস্ট্রং তাঁর বই Holy War এ খলিফা ওমর (রাঃ) এর জেরুসালেম জয় সম্পর্কে লেখেন : একটি সাদা উটে চড়ে খলিফা ওমর জেরুসালেমে প্রবেশ করেন। শহরের ম্যাজিস্ট্রেট গ্রীক গির্জা প্রধান সোফরোনিয়াস তাঁর সহচর ছিলেন। খলিফা এলাকায় উপস্থিত হয়েই মাউন্ট টেম্পলে যেতে চাইলেন এবং হাঁটু গেড়ে বসে যেখান থেকে তাঁর বন্ধু মুহাম্মাদ আল্লাহ্’র উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন ঐ জায়গায় প্রার্থনা করলেন।

গির্জা প্রধান খুবই ভয়ের সাথে খলিফার আচরণ দেখলেন ; তাঁর ধারণা হয় যে এই-ই নিশ্চয়ই সেই ঘৃণ্য ও বিভীষিকার খৃস্ট বিরোধী ব্যক্তি যে কিয়ামতের পূর্বলক্ষণ ও হযরত ড্যানিয়েলের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী যে এই পবিত্র স্থানে ঢুকবে। ওমর এরপর খৃস্টানদের কোন পবিত্র ধর্মীয় উপাসনালয় দেখতে চান। যখন তিনি পবিত্র Sepulchre গির্জা পরিদর্শন করছিলেন , তখন মুসলমানদের নামাজের সময় হয়। ভদ্রতা করে গির্জা প্রধান খলিফা ওমরকে সেখানেই অর্থাৎ খৃস্টানদের প্রার্থনালয়ে নামাজ পড়তে অনুরোধ করেন। কিন্তু ওমর বিনয়ের সাথে এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। কেননা , তিনি যদি গির্জার মধ্যে নামাজ আদায় করেন তবে ভবিষ্যতে তাঁর সম্মানে মুসলমানরা এ জায়গায় মসজিদ বানাতে চাইবে। তার মানে গির্জা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তাই ওমর গির্জা থেকে অল্প দূরে গিয়ে নামাজ আদায় করেন।

গির্জার বিপরীতে ঐ স্থানে ওমরের স্মরণে উৎসগীকৃত ছোট্ট একটি মসজিদ এখনো রয়েছে। ওমরের নামে বিখ্যাত আরেকটি মসজিদ হলো টেম্পল মাউন্ট যা মুসলিম বিজয়ের সাক্ষ্য বহন করে। আল-আকসা মসজিদের সাথে একত্রে এটা মুহাম্মদের রাতের যাত্রা (শবে মেরাজে আল্লাহ’র সান্নিধ্যে যাওয়া)কে মনে করিয়ে দেয়। বহু বছর ধরে ইয়াহূদীদের এই

প্রার্থনালয়কে খৃস্টানরা ময়লা ফেলার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করতো। খলিফা এই জায়গা পরিষ্কার করতে মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য নিজের হাতে ময়লা সাফ করেন। মুসলমানরা এখানে তাঁদের দুইটি পবিত্র ধর্মীয় স্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করে ---- এ জায়গা ইসলামের তৃতীয় পবিত্র নগরী হিসাবে বিবেচিত (টীকা ২১)।

মুসলমানরা জেরুসালেম জয় করার পর এই নগরী একটি নিরাপদ স্বর্গে পরিণত হয় সেখানে তিন ধর্মের মানুষেরা শান্তিতে একসাথে বসবাস করতে পারতো। জন এল এসপোসিটো লেখেন , যখন ৬৩৮ খৃস্টাব্দে আরব বাহিনী জেরুসালেম দখল করে তখন তাঁরা একটি কেন্দ্র দখল করে যেখানকার পবিত্র ধর্মীয় স্থানগুলি খৃস্টান জগতে অন্যতম প্রধান তীর্থস্থানে পরিণত হয়। গির্জা ও খৃস্টান জনগণের কোন ক্ষতি সাধন করা হয় নি। শাসকরা অনেকদিন ধরেই ইয়াহুদী রা এখানে বসবাস নিষিদ্ধ করে রেখেছিল ; মুসলিমদের সময়ে ইয়াহুদী রা এখানে ফিরে আসার ও থাকার অনুমতি পায় এবং সলোমন ও দাউদের শহরে উপাসনা করার অনুমতি পায়
(টীকা ২২)।

খলিফা ওমর যখন জেরুসালেমে প্রবেশ করেন , তখন তিনি এই নগরীর খৃস্টান ধর্মযাজকের সাথে নীচের চুক্তি স্বাক্ষর করেন: আল্লাহ’র দাস ও বিশ্বাসীদের নেতা ওমরের পক্ষ থেকে টুষরধ শহরের মানুষদের নিরাপত্তা প্রদান করা হলো ; ওমর এই নিরাপত্তা সবাইকে প্রদান করছে------অসুস্থ বা সুস্থকে , তাঁদের জীবনের নিরাপত্তা , তাঁদের সম্পদের নিরাপত্তা , তাঁদের গির্জাগুলি ও ক্রসচিহ্ন এবং আর যা কিছু তাঁদের ধর্মসংক্রান্ত সে সবের নিরাপত্তা । গির্জাগুলিকে অবশ্যই থাকার জায়গায় পরিণত করা হবে না অথবা ধ্বংস করা হবে না বা গির্জা বা তার সংলগ্ন কোন কিছুকে ভেঙ্গে ছোট করা হবে না। স্থানীয়দের কোন ক্রস বা সম্পদের কোন ক্ষতি করা যাবে না ; ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন কিছু স্থানীয়দের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া যাবে না অথবা তাঁদের কারো কোন অনিষ্ট করা যাবে না (টীকা ২৩)।

সংক্ষেপে বলতে গেলে , মুসলমানরা জেরুসালেম ও সমগ্র ফিলিস্তিনে সভ্যতা বয়ে নিয়ে আনে। যে বিশ্বাস অন্য মানুষের পবিত্র ধর্মীয় মতকে শ্রদ্ধা করে না এবং তাঁদেরকে শুধুমাত্র এই কারণে মেরে ফেলা হয় যে তাঁদের ধর্মীয় মত আলাদা--এ ধরণের বিশ্বাসের বদলে ইসলামের ন্যায়পরায়ন , সহনশীল ও মধ্যপন্থী সংস্কৃতি এই এলাকাকে শাসন করে। ওমর (রা:) ফিলিস্তিন দখল করার পর সেখানে মুসলিম , খৃস্টান ও ইয়াহুদী

রা একসাথে শান্তি ও ঐক্যের মধ্যে বসবাস করেছিল। মুসলিমরা কখনোই মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে জোর খাটায় নি। কিছু অমুসলিম ইসলামকে সত্য ধর্ম হিসাবে বুঝতে পেরে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়। ফিলিস্তিনে ততদিনই শান্তি ও ঐক্য বজায় ছিল যতদিন মুসলমানরা এই এলাকা শাসন করে। ১১ শতাব্দীর শেষ দিকে , বাইরের এক বিজয়ী শক্তি এই এলাকায় ঢুকে ও জেরুসালেমের সভ্য এলাকা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার সাথে এমনভাবে লুণ্ঠিত হয় যা আগে কখনোই দেখা যায় নি। ক্রুসেডার (খৃস্টান ধর্মযোদ্ধারা) ছিল এই বর্বর ও অসভ্য দল।

খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের বর্বরতা:

ফিলিস্তনে যখন তিন পবিত্র ধর্মের মানুষেরা একসাথে শান্তিতে বসবাস করছিল , তখন ইউরোপের খৃস্টান রা ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করতে মনস্থ করে। ১০৯৫ সালের ২৭ নভেম্বরে ঈষবৎসড়হঃ এর কাউন্সিলে পোপ আরবানের আহ্বানে সমগ্র ইউরোপ থেকে এক লাখেরও বেশী ধর্মযোদ্ধা সমবেত হয় পবিত্র ভূমি জেরুসালেমকে মুসলমানদের কাছ থেকে উদ্ধারের জন্য এবং প্রাচ্যের পৌরাণিক গুপ্তধন খুঁজে পেতে; দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রা এবং পথে পথে দস্যুতা ও হত্যাকান্ড ঘটিয়ে তারা ১০৯৯ খৃস্টাব্দে জেরুসালেমে পৌঁছে।

এই নগরী প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ধরে অবরুদ্ধ থাকে ; এরপর ধর্মযোদ্ধারা শহরে প্রবেশ করে। শহরে ঢুকে তারা যে নিষ্ঠুর অত্যাচার চালায় , বিশ্ব এরকম খুব কমই দেখেছে। সব মুসলমান ও ইয়াহুদী কে তলোয়ারের আওতায় আনা হয় অর্থাৎ নৃশংসভাবে মেরে ফেলা হয়। ওমর (রা:) এর সময় থেকে ফিলিস্তিনে যে শান্তি ও ঐক্য ছিল তা নৃশংস হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেল। ধর্মযোদ্ধারা খৃস্ট ধর্ম যা কিনা ভালবাসা ও সহানুভূতির ধর্ম তার সব নৈতিক মুল্যবোধ ভঙ্গ করে এবং খৃস্ট ধর্মের নামে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়।

সালাদীনের ন্যায়-বিচার:

বর্বর ধর্মযোদ্ধারা জেরুসালেমকে তাদের রাজধানী বানায় এবং একটি ল্যাটিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ; যার সীমানা বাড়ানো হয় ফিলিস্তিন থেকে এন্টিয়ক পর্যন্ত। অবশ্য যে ধর্মযোদ্ধারা ফিলিস্তিনে নিষ্ঠুরতা বয়ে নিয়ে এসেছিল , তারা বেশীদিন সেখানে স্থায়ী হয় নি। সালাদীন সব মুসলিম রাজ্যকে ‘ পবিত্র যুদ্ধের ’ পতাকাতলে আনেন এবং খৃস্টান ধর্ম যোদ্ধাদেরকে হিত্তিনের

যুদ্ধে পরাজিত করেন (১১৮৭ সাল)। যুদ্ধের পর ক্রসেডার বা খৃস্টান বাহিনীর দুই নেতা চ্যাটিলনের রেনাল্ড ও রাজা গাইকে সালাদীনের সামনে হাজির করা হয়। মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক নির্মম অত্যাচার চালানোর দায়ে রেনাল্ড ছিল কুখ্যাত। তাই সালাদীন তাকে মৃত্যুদন্ড দেন কিন্তু রাজা গাইকে মুক্তি দেয়া হয় কেননা সে এ ধরণের কোন বর্বর অত্যাচার মুসলমানদের বিরুদ্ধে করে নি। ন্যায়-বিচারের প্রকৃত অর্থ কী , তা ফিলিস্তিন আরো একবার দেখলো।

হিত্তিনের যুদ্ধের পরপরই এবং এক শবে মেরাজের দিনে সালাদীন জেরুসালেমে প্রবেশ করেন { শবে মেরাজ : হযরত মুহাম্মাদ (দ:) মক্কা থেকে জেরুসালেমে ও সপ্ত আকাশে আল্লাহ্'র সান্নিধ্যে এক রাতের মধ্যে আসা-যাওয়া করেন } । সালাদীন সেখানে খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের ৮৮ বছরের দখলদারীর অবসান ঘটান। খৃস্টান ধর্মযোদ্ধারা যখন এই নগরী দখল করেছিল, তখন তারা এই নগরীর ভিতরের সব মুসলমানদের হত্যা করে। সেজন্য তারা স্বভাবতই ভয় পাচ্ছিলো এই ভেবে যে , নিশ্চয়ই সালাদীনও এখন তাদের সবাইকে হত্যা করবেন। কিন্তু সালাদীন শহরের একজন খৃস্টানকেও স্পর্শও করলেন না। তিনি ল্যাটিন (ক্যাথলিক) খৃস্টান দের আদেশ দিলেন এই এলাকা থেকে চলে যেতে। অর্থোডক্স খৃস্টান যারা ধর্মযোদ্ধা ছিল না , তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হলো শহরের মধ্যে বাস করতে এবং তাঁদের পছন্দমতো উপাসনা করতে।

জন এল এসপোসিটোর ভাষায়: মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে যতটা একগুঁয়ে ছিল , ঠিক ততটাই মহানুভব ছিল তাঁরা বিজয়ের পর। বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষমা করা হয় ; গির্জা ও ধমীয় পবিত্র স্থানগুলিকে স্পর্শ করা হয় নি। সালাদীন তাঁর কথার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং নিরস্ত্র বেসামরিক ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন (টীকা ২৪) ।

জেরুসালেমের দ্বিতীয় দখল সম্পর্কে কারেন আর্মস্ট্রং লেখেন , ১১৮৭ খৃস্টাব্দের ২ অক্টোবর সালাদীন ও তাঁর বাহিনী বিজয়ীর বেশে জেরুসালেমে প্রবেশ করেন এবং পরবতী ৮০০ বছর জেরুসালেম একটি মুসলিম নগরী হিসাবে ছিল; সালাদীন

তাঁর কথা রক্ষা করেন ও ইসলামের সর্বোচ্চ আদর্শ অনুসারে এই শহর জয় করেন । ১০৯৯ খৃস্টাব্দে মুসলিমরা যে নৃশংস গণহত্যার শিকার হয় তার প্রতিশোধ তিনি নেন নি কূরআনের ১৬ নং সুরার উপদেশ অনুযায়ী .... ধৈর্য ধরো আর ধৈর্য ধরা তো কেবল আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের কারণে দু:খ করবে না এবং তারা যে সব ষড়যন্ত্র করছে সেজন্য সংকীর্ণমনা হবে না (সুরা নাহল; ১৬: ১২৭)। এখন যেহেতু শত্রুতা বন্ধ রয়েছে তাই তিনি হত্যা বন্ধ করেন ......‘‘ আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ফেতনার অবসান হয় এবং দীন শুধু আল্লাহ’র জন্য । তারপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তবে সীমা লংঘনকারীদের ছাড়া আর কাউকে আক্রমণ করবে না.....এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো : আল্লাহ তো বিশ্বাসীদের সাথে রয়েছেন (সুরা বাকারা, ২: ১৯৩–১৯৪) । একজন খৃস্টানকেও হত্যা করা হয় নি এবং কোনরকম লুটপাট করা হয় নি। মুক্তিপণ ইচ্ছা করেই খুব কম রাখা হয়–––– মুক্তিপণ দিতে না পারায় যারা পরিবার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল , তাদের করুণ অবস্থা দেখে সালাদীনের চোখে পানি চলে আসে ; তিনি অসংখ্য বন্দীকে বিনা পণে মুক্তি দেন যা কুরআনে আহ্বান করা হয়েছে ; যদিও অনেক দিন ধরেই সালাদীনের কোষাগারের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। তাঁর ভাই আল–আদিল বন্দীদের করুণ অবস্থা দেখে এত দু:খ পান যে তিনি সালাদীনকে অনুরোধ করেন বন্দীদের মধ্যে এক হাজারজনকে দাস হিসাবে তাঁকে দিয়ে দেয়ার জন্য। এরপর তিনি সাথে সাথেই সেই সব বন্দীদের মুক্তি দেন............ধনী খৃস্টানরা সামান্য মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের ধন–সম্পদ নিয়ে এলাকা থেকে চলে যাচ্ছিলো , অথচ এই সম্পদ সব খৃস্টান বন্দীকে মুক্ত করার কাজে খরচ করা যেতো......এই লজ্জাজনক কাজ দেখে সব মুসলমান নেতাই ব্যাথিত হন। গির্জা প্রধান হ্যারাক্লিয়াস আর সবার মত মাত্র দশ দিনার মুক্তিপণ দেন; এমন কি তাঁকে বিশেষ নিরাপত্তা দেয়া হয় যাতে তিনি তাঁর ধন–সম্পদ নিয়ে নিরাপদে গন্তব্যস্থল টাআয়ারে যেতে পারেন (টীকা ২৫) ।

সংক্ষেপে বলা যায় , সালাদীন ও তাঁর অনুগত মুসলিম বাহিনী খৃস্টানদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল ও ন্যায় আচরণ করেছেন। এমন কী , খৃস্টানদের নিজেদের নেতারা তাদেরকে যেটুকু সহানুভূতি দেখিয়েছে ,তার থেকে অনেক বেশী সহানুভূতি খৃস্টানদের প্রতি মুসলিমরা প্রদর্শন করেছে। মুসলমনদের জেরুসালেম জয়ের পর শুধু খৃস্টানরা নয় , ইয়াহূদীরাও সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা পায়।

বিখ্যাত স্প্যানীশ-ইয়াহুদী কবি এহুদা আল-হারিজী এক লেখায় তাঁর অনুভূতি এভাবে প্রকাশ করেছেন : স্রষ্টা.............সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পবিত্র ভূমি আর Esau এর সন্তানদের হাতে থাকবে না.........তাই সৃষ্টির ৪৯৫০ বছর পর স্রষ্টা (১১৯০ খৃস্টাব্দে) ইসমাইলের বংশধরদের যুবরাজ (সালাদীন) কে উদ্বুদ্ধ করলেন ; একজন বিচক্ষণ ও সাহসী মানুষ, যিনি তাঁর সম্পূর্ণ বাহিনী নিয়ে আসলেন , জেরুসালেমকে অবরোধ করলেন , নিয়ে নিলেন এবং সারা দেশ জুড়ে ঘোষণা দিলেন যে তিনি এফ্রেমের বংশধরদের গ্রহণ করবেন , যেখান থেকেই তাঁরা আসুক না কেন। তাই আমরা পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে এসে এখানে আবাস গড়েছি। আমরা এখন শান্তির ছায়াতে আছি(টীকা ২৬) ।

জেরুসালেমের পর ফিলিস্তিনের অন্যান্য শহরে খৃস্টান ধর্মযোদ্ধারা তাদের বর্বরতা ও মুসলমানরা তাঁদের ন্যায়বিচারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। ব্রিটিশ ইতিহাসে বীর নায়ক হিসাবে যাকে দেখানো হয় সেই সিংহ হৃদয় রিচার্ড ১১৯৪ খৃস্টাব্দে তিন হাজার মুসলমানকে যাদের মধ্যে অনেক নারী ও শিশুও ছিল তাঁদেরকে একর দুর্গে হত্যা করে। মুসলমানরা এই ধরণের নৃশংস হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করার পরও কখনোই এই ধরণের আচরণ অনুসরণ করে নি। তাঁরা আল্লাহ’র আদেশ মেনেছে ‘‘ মসজিদে হারামে তোমাদের ঢুকতে বাধা দেয়ায় কোন কওমের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের কখনও সীমা লংঘনে প্ররোচিত না করে......(সুরা মায়িদা, ৫:২) এবং কখনোই নিরপরাধ বেসামরিক মানুষদেরকে আক্রমণ করে নি। তাঁরা কখনোই অপ্রয়োজনে কাউকে এমন কী পরাজিত খ্রীস্টান ধর্মযোদ্ধাদেরও আক্রমণ করে নি। খ্রীস্টান ধর্মযোদ্ধাদের বর্বরতা আর মুসলমানদের ন্যায়-বিচার আরো একবার একটি ঐতিহাসিক সত্যকে প্রকাশ করলো : ইসলামের নীতিমালার আলোকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠিত হলে সেটা ভিন্ন মতের মানুষদেরকে একত্রে বসবাসের অনুমতি দেয়। এই সত্যের প্রকাশ ঘটতে থাকে সালাদীনের ৭০০ বছর পরেও বিশেষত: অটোমান সাম্রাজ্যে।

অটোমান সম্রাটের ন্যায় ও সহনশীল শাসন:

১৫১৪ খৃস্টাব্দে সুলতান সেলিম জেরুসালেম ও আশপাশের এলাকা দখল করেন । ফিলিস্তিনে প্রায় চারশত বছরের অটোমান শাসন তখন থেকে শুরু হয়। অন্যান্য অটোমান রাষ্ট্রের মত , ফিলিস্তিনে এই শাসনকালে শান্তি, স্থিতিশীলতা

ও ভিন্ন মতো মানুষদের একত্রে বসবাসের সুযোগ প্রতিষ্ঠা করে।

অটোমান সাম্রাজ্যের পরিচালনা ব্যাবস্থা গড়ে উঠেছিল মিল্লাত পদ্ধতিতে (যার ব্যাখ্যায় বলা যায় ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়) । এর মূল বৈশিষ্ট্য এটাই ছিল যে ভিন্ন ধর্মমতের মানুষেরা নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী অন্যদের সাথে বাস করতে পারতো । এমন কী আইনগত ব্যবস্থার সুবিধাও পেত। খৃস্টান ও ইয়াহুদী যাদেরকে পবিত্র কুরআনে ‘ আসমানী কিতাবের মানুষ ’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে , তাঁরা অটোমান রাজ্যে সহনশীলতা, নিরাপত্তা আর স্বাধীনতা খুঁজে পায়। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, যদিও অটোমান সাম্রাজ্য ছিল মুসলিম শাসকদের দ্বারা পরিচালিত একটি ইসলামিক রাষ্ট্র; তবুও নাগরিকদের মধ্যে যারা অন্য মতে বিশ্বাসী তাঁদেরকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানোর কোন ইচ্ছা মুসলিম শাসকদের ছিল না। বরং অটোমান রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল অমুসলিমদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা এবং তাঁদেরকে এমন এক শাসনব্যবস্থায় পরিচালিত করা যাতে তাঁরা ইসলামের আইন ও ন্যায়পরায়নতায় সন্তুষ্ট হয়। অন্যান্য বড় রাষ্ট্রগুলিতে একই সময় ক্ষমতাসীন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ত্রুটিপূর্ণ , বৈষম্যমুলক ও অসহনশীল। স্পেন এটা সহ্য করতে পারে নি যে স্প্যানীশ উপদ্বীপে মুসলিম ও ইয়াহুদী দের অস্তিত্ব থাকবে। তাই এই দুই সম্প্রদায়ের উপরেই স্পেন ভয়াবহ সন্ত্রাস চাপিয়ে দেয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইয়াহুদী রা নির্যাতিত হয় (যেমন সুবিধা বঞ্চিত বিভিন্ন এলাকায় ইয়াহুদী রা বন্দী ছিল) শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা ইহুদি এবং কখনো কখনো তাঁরা নির্বিচারে গণহত্যার শিকার হয় । খৃস্টানরা এমন কি নিজেদের ধর্মেরই অন্য মতের দলকে সহ্য করতে পারতো না। ১৬ ও ১৭ শতাব্দীতে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যানদের মধ্যে সংঘর্ষ ও ব্যাপক হত্যাকান্ড ইউরোপকে রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। এই ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যানদের সংঘর্ষের একটি ফলাফল হলো ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরিণাম হলো মধ্য ইউরোপ একটি যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হয় , আর শুধু জার্মানীতেই ১৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে প্রতি তিনজনের একজন খুন হয়। এটা বিতর্কের উর্ধ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য যে , এ ধরণের পরিবেশের মধ্যে অটোমান শাসন ছিল চূড়ান্তভাবে মানবিক। অনেক ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই সত্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এদের একজন হলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে

বিশেষজ্ঞ বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাঈদ । জেরুসালেমের এক খৃস্টান পরিবার থেকে আগত সাঈদ তাঁর জন্মভূমি থেকে বহু দূরে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বসে তাঁর গবেষণাকাজ চালিয়ে যান। ইসরাইলের পত্রিকা Ha'aretz এর সাথে এক সাক্ষাতকারে তিনি ‘ অটোমান শাসন ব্যাবস্থার’ সুপারিশ করেন , যদি মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। সাঈদ যা বলেন তাহলো : সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে ইয়াহূদী রা টিঁকে থাকতে পারবে সেভাবে , যেভাবে আরব বিশ্বে অন্যান্য সংখ্যালঘুরা রক্ষা পেয়েছিল...........মিল্লাত পদ্ধতি অটোমান সাম্রাজ্যে খুব ভাল কাজ করেছে; সেসময় তাঁদের যে নিয়ম ছিল তা আমাদের এখনকার নিয়মের তুলনায় অনেক অনেক মানবিক বলেই মনে হয় (টীকা ২৭) ।

ইতিহাস দেখাচেছ যে , ইসলামই একমাত্র ধর্মীয় ব্যবস্থা যা মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়পরায়ন, সহনশীল ও সহানুভূতিশীল শাসনব্যবস্থার প্রস্তাব দিতে পারে। এই এলাকা থেকে অটোমান শাসন প্রত্যাহার করার পর আজো পর্যন্ত এর বিকল্প কোনকিছু আসে নি। এ কারণে , মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আনতে হলে অটোমান আদর্শ চালু করতে হবে যার বৈশিষ্ট্য ছিল কূরআনের দূইটি মৌলিক শিক্ষা : সহনশীলতা ও সমঝোতা। সত্যিকারভাবে অনুসরণ করা হলে ইসলামই হলো সব ধরণের সংঘর্ষ , দ্বন্দ্ব , যুদ্ধ ও সন্ত্রাস বন্ধের সমাধান ও শান্তি , ন্যায়–বিচার ও সহনশীলতার জামিনদার।

সন্ত্রাসের প্রকৃত ভিত্তি বা কারণ : ডারউইনিজম ও জড়বাদ তত্ত্ব (ভোগবাদিতা বা মেটিরিয়েলিজম)

––––বেশীরভাগ মানুষই মনে করে যে , চার্লস ডারউইনই প্রথম বিবর্তনবাদের তত্ত্ব উপস্থাপন করেন , যা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ , পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আসলে, সত্যি কথা হলো যে ডারউইন এর মুল প্রবক্তা নন এবং এই মতবাদ কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। জড়বাদ দর্শনের প্রাচীন মতকে সামান্য কিছু বদলে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব গঠিত হয়েছে। যদিও এই তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নয় , জড়বাদ (ভোগবাদিতা) দর্শনের স্বার্থে এই মতকে অন্ধভাবে সমর্থন করা হয়েছে ; (পড়ূন হারুন ইয়াহিয়ার The Evolution Deceit , তা হা পাবলিশার্স , ১৯৯৯)।

সব ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যেই ধর্মোন্মত্ততার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ডারউইনের মতের প্রসার ও জড়বাদ আদর্শ যাকে এই মত সমর্থন করে এই দুইয়ের কারণে ‘ মানুষ কী ? এই প্রশ্নের উত্তর বদলে গিয়েছে। যে মানুষ এই প্রশ্নের উত্তরে বলতো , ‘ মানুষ স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট এবং স্রষ্টার শিখানো সুন্দর, নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করে মানুষ বেঁচে থাকবে ’ ; তাঁরা চিন্তা করা শুরু করলো ‘ মানুষের সৃষ্টি হয়েছে হঠাৎ করেই এবং মানুষ এমন এক প্রাণী যাকে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে নিজেদের বিকাশ ঘটাতে হবে’ ।

এই বড় ধরনের প্রতারণার জন্য মানুষকে সাংঘাতিক মুল্য দিতে হবে। সংঘর্ষপুর্ণ মতবাদগুলি যেমন বর্ণবাদ , ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদ এবং আরো অনেক বর্বর বিশ্ব মতবাদের ভিত্তি হলো দ্বন্দ্ব; এই সব মতবাদই ঐ প্রতারণামূলক মত থেকে শক্তি পেয়েছে। এই বিশ্ব ডারউইনিজম থেকে যে বিপর্যয় দেখেছে সেটা বইয়ের এই অংশে পরীক্ষা করে দেখা হবে এবং যে সন্ত্রাস বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা সেই সন্ত্রাসের সাথে ডারউইনিজমের সম্পর্ক প্রকাশ করবে।

ডারউইনিজমের মিথ্যা : ‘ জীবন হলো দ্বন্দ্ব’

----- ডারউইন একটি মুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে তার তত্ত্বের বিকাশ ঘটান --- জীবন্ত প্রাণীর বিকাশ নির্ভর করে বেঁচে থাকার সংগ্রামের উপর। যে শক্তিশালী সে সংগ্রামে জিতবে। যে দুর্বল সে বেঁচে থাকার যোগ্য নয় এবং তাই সে পরাজিত হয়ে বিস্মৃতির অতলে চলে যাবে।

ডারউইনের মতে , বেঁচে থাকার জন্য এক নিষ্ঠুর সংগ্রাম করতে হয় এবং প্রকৃতিতে এক অন্তহীন দ্বন্দ্ব চলছে। যে শক্তিশালী সে সবসময়ই দুর্বলকে হটিয়ে দেয় এবং এভাবেই উন্নয়ন ঘটে। ডারউইন তার বইয়ের উপ-শিরোনাম যেভাবে দিয়েছেন তাতে এই মতের প্রকাশ ঘটে । ডারউইন তার The Origin of Species (প্রজাতির সুচনা) বইতে একটি উপ-শিরোনাম দিয়েছেন : The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the strength for life " (প্রকৃতির নির্বাচন বা জীবনের উন্নয়নের প্রয়োজনে পছন্দের জাতির রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রজাতির সুচনা) । ডারউইন মত দেন যে বেঁচে

থাকার সংগ্রাম মানবজাতির বিভিন্ন দলের জন্যও প্রযোজ্য।

এই কাল্পনিক দাবী অনুসারে নির্বাচিত জাতি সংগ্রামে জয়ী হবে। ডারউইনের দৃষ্টিতে পছন্দের জাতি হলো ইউরোপের সাদা মানুষেরা । আফ্রিকান অথবা এশিয়ার জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা টিঁকে থাকার সংগ্রামে পিছিয়ে পড়ার দলে। ডারউইন আরো এক ধাপ এগিয়ে মত দেন যে এই জাতিগোষ্ঠির মানুষরা খুব তাড়াতাড়ি টিঁকে থাকার সংগ্রামে সম্পূর্ণ পরাজিত হবে এবং পৃথিবী থেকে একদম হারিয়ে যাবে: ডারউইন অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় অধিবাসী (উপজাতিদের) এবং নিগ্রোদেরকে গরিলার সাথে একই স্তরে এনে তুলনা করেন ও ভবিষ্যৎবাণী করেন যে এরা চিরতরে হারিয়ে যাবে।

ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ ললিতা বিদ্যার্থী ব্যাখ্যা করেছেন ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব কিভাবে সমাজবিজ্ঞানে বর্ণবিদ্বেষ চাপিয়ে দিয়েছে : সমাজবিজ্ঞানীরা ডারউইনের যে যোগ্য সেই টিঁকে থাকবে–––এই মতকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তারা বিশ্বাস করে মানুষ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁচেছে (টীকা ২৯)।

ডারউইনের অনুপ্রেরণার উৎস: ম্যালথাসের মতবাদের নিষ্ঠুরতা

ডারউইনের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ থমাস ম্যালথাসের বই ‘ An Essay on the Principle of Population’ (জনসংখ্যা নীতির উপর একটি প্রবন্ধ)। ম্যালথাস এক পরিকল্পিত হিসাব দেখালো যে মানুষের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। তার মতে , জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে মূলত: বিভিন্ন বিপর্যয়সমূহ যেমন যুদ্ধ , দুর্ভিক্ষ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখে । সংক্ষেপে বলা যায় , এই নিষ্ঠুর দাবী অনুসারে অন্যরা যাতে বেঁচে থাকতে পারে তাই কিছু মানুষকে অবশ্যই মরতে হবে। মানুষের বেঁচে থাকা মানে হলো সার্বক্ষণিক যুদ্ধ।

১৯ শতাব্দীতে ম্যালথাসের মত ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। বিশেষ করে , ইউরোপের উঁচু সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণী

ম্যালথাসের এই নিষ্ঠুর ধারণাকে সমর্থন করেন। ১৯ শতাব্দীর ইউরোপ ম্যালথাসের জনসংখ্যার নীতির দৃষ্টিভঙ্গীকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিল তা বোঝাতে জেরী বার্গম্যান তাঁর ‘ The Scientific Background of the Nazi "Race Purification" Programme” (নাৎসীদের জাতিগত শুদ্ধতাকরণ কর্মসূচীর বৈজ্ঞানিক পটভূমি)’ প্রতিবেদনে লেখেন : ১৯ শতাব্দীর শুরুতে পুরো ইউরোপ জুড়ে শাসক শ্রেণীর সদস্যরা একত্র হয়ে নব– আবিষ্কৃত ‘ জনসংখ্যা সমস্যা ’ নিয়ে আলোচনায় বসে ও বুদ্ধি বের করে কিভাবে ম্যালথাসীয় নির্দেশের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে গরীবদের মৃত্যুর হার বাড়ানো যায়। ‘‘ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার জন্য সুপারিশ না করে আমরা বরং গরীবদের জন্য বিপরীত অভ্যাসগুলিকে উৎসাহিত করবো। শহরে আমরা অবশ্যই রাস্তা চিকন করে বানাবো , বেশী মানুষকে বাসাবাড়িতে রাখবো ও মহামারীকে আমন্ত্রণ জানাবো। বদ্ধ পুকুরের পাশে গ্রাম বানাতে হবে এবং বিশেষ করে অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকর জলাভূমির পাশে বসতি স্থাপনে উৎসাহ দিতে হবে। ’’ এবং এরকম আরো কিছু ... (টীকা ৩০) ।

এ ধরনের নিষ্ঠুর নীতির কারণে যে দুর্বল এবং যে জীবন সংগ্রাম করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে ধ্বংস হয়ে যাবে ; এবং এর ফলে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে ভারসাম্য আসবে।

গরীবদের উপর এ সব ‘অত্যাচারমুলক নীতি’ আসলেই ১৯ শতাব্দীতে ব্রিটেনে বাস্তবায়িত হয়েছিল। শিল্প সংক্রান্ত একটি আদেশ জারী করা হয় যার ফলে ৮ ও ৯ বছরের শিশুদেরকে কয়লা খনিগুলিতে রোজ ১৬ ঘন্টা করে কাজ করতে হতো। এ কারণে হাজার হাজার শিশু শ্রমিক ভয়ানক করুণ অবস্থার শিকার হয়ে মারা যায়।

ম্যালথাসের বেঁচে থাকার সংগ্রামের তত্ত্ব ব্রিটেনের লাখ লাখ মানুষের জীবনকে দু:খ–কষ্টে পরিপূর্ণ করে দেয়। এই সব ধারণায় প্রভাবিত হয়ে ডারউইন এই বেঁচে থাকার সংগ্রামের তত্ত্ব পুরো প্রকৃতির উপর প্রয়োগ করে এবং বলে , যে যোগ্য ও শক্তিশালী সেই এই সংগ্রামে বিজয়ী হবে। ডারউইন আরো দাবী করে যে এই সংগ্রাম ন্যায়সঙ্গাত ও প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধান। মানুষকে বলা হয় যেন তাঁরা ধর্মীয় বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে এবং সব ধরনের নৈতিক মুল্যবোধ যা এই

নিষ্ঠুর নীতি বাস্তবায়নের পক্ষে বাঁধা হতে পারে , সেই সব নীতিকে তুচ্ছ করতে শেখে।

বিংশ শতাব্দীতে মানবতাকে চরম মূল্য দিতে হয় এসব অনুভূতিহীন মতাদর্শ প্রচারের জন্য যা মানুষকে নিষ্ঠুর ও নির্মমতার পথে নিয়ে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভিত তৈরীতে ডারউইনিজমের ভূমিকা:

ডারউইনিজম যেহেতু ইউরোপের সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছিল , তাই বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম তত্ত্বের নানা প্রতিক্রিয়া সমাজে লক্ষ্য করা যায়।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক জাতিগুলি যেসব দেশকে উপনিবেশে পরিণত করেছিল তাঁদেরকে ‘ বিবর্তনের পশ্চাতগামী জাতি ’ (Evolutionary backward nation) হিসাবে চিহ্নিত করে এবং এর বৈধতা পেতে ডারউইনিজমের আশ্রয় নেয়। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু হওয়া ডারউইনিজমের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও রক্তাক্ত রাজনৈতিক ফলাফল।

ইউরোপের সেই সময়ের শাসক শ্রেণীর ডারউইনিজমে বিশ্বাসই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভিত তৈরী করে। যুদ্ধের অন্যতম প্রধান এই কারণকে ব্রিটেনের ইতিহাস বিষয়ের এক বিখ্যাত অধ্যাপক জেমস জল তাঁর Europe Since 1870 বইতে ব্যাখ্যা করেন ....এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ‘ বেঁচে থাকার সংগ্রাম ’ ও ‘যে বেশী যোগ্য সেই বেঁচে থাকবে’ এই মতবাদগুলিকে বিশ্বযুদ্ধের আগের বছরগুলিতে ইউরোপের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতারা কিভাবে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন।

যুদ্ধের পরে অস্ট্রো–হাঙ্গেরিয়ান চীফ অফ স্টাফ Franz Baron Conrad von Hoetzendorff তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন: মানব হিতৈষী ধর্মসমূহ , নৈতিক শিক্ষা ও দার্শনিক মতগুলি মাঝেমাঝে অবশ্যই মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের নির্মম পদ্ধতিকে দুর্বল করে দেয় : তবে এসব কখনোই বিশ্বের মূল চালনাশক্তি হিসাবে একে (ডারউইনিজমকে) পুরোপুরি দূর করতে সমর্থ হবে না। ঐ মহান নীতি অনুসারেই চালিকা শক্তিগুলির ফল মহাযুদ্ধের অনর্থ

বিভিন্ন রাষ্ট্র ও মানুষের জীবনে এসেছে ; এটা এক বজ্রপাতের মতো যা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী অবশ্যম্ভাবী।

অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধের পক্ষে কনরেডের এই জেদ বোধগম্য। আমরা এটাও দেখতে পাই যে, এইসব দৃষ্টিভঙ্গী শুধুমাত্র সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যেমন Max Weber আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। এছাড়া , ১৯১৪ সালে জার্মান চ্যান্সেলর Theobald von Bethmann-Hollweg, এর ব্যক্তিগত সহকারী Kurt Riezler লেখেন :মানুষে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে চিরন্তন ও অনিয়ন্ত্রিত ঘৃণা সেই আদিমকাল থেকেই স্বাভাবিক বিষয় এবং যে শত্রুতা আমরা সব জায়গায় দেখি ---এটা মানবপ্রকৃতির বিকৃত মানসিকতা নয় বরং পৃথিবীর অপরিহার্য উপাদান ও জীবনের উৎস (টীকা ৩১) ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন জেনারেল Friedrich von Bernardi মানবসৃষ্ট যুদ্ধ ও প্রকৃতিতে যে সংগ্রাম রয়েছে এই দুইয়ের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেন। বার্ণারডী বলেন , যুদ্ধ হলো জীববিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন। প্রকৃতির উপাদানগুলির জন্য জীবন সংগ্রাম যতটা দরকার , যুদ্ধও ঠিক ততটাই অপরিহার্য। যেহেতু এর সিদ্ধান্তগুলি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর বৈশিষ্ট্যের উপরেই , তাই জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি যথার্থ সিদ্ধান্ত দেয় (টীকা ৩২) ।

আমরা দেখি যে , ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ইউরোপীয় চিন্তাবিদ , জেনারেল ও শাসকদের জন্য । এরা যুদ্ধ , রক্তপাত ও দু:খ-কষ্টকে এক ধরণের উন্নয়ন হিসাবে দেখতো এবং মনে করতো যে এসব হলো প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় আইন। যে আদর্শগত ভিত্তি এই প্রজন্মকে এমন ধ্বংসাত্মক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে , তা আর কিছুই নয় বরং ডারউইনের বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও ‘ পছন্দের জাতিসমুহ ’ মতবাদ। প্রথম মহাযুদ্ধে আশি লক্ষ মানুষ মারা যায় , শত শত নগরী ধ্বংস হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আহত হয় , খোঁড়া হয় , গৃহহীন হয় ও বেকার হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের একুশ বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধের ফলে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এই যুদ্ধেরও মুল কারণ ছিল ডারউইনিজম।

‘ জঙ্গলের নীতি ’ কোন পথে মানুষকে পরিচালিত করে ? উত্তর হলো : ফ্যাসীবাদ

১৯ শতাব্দীতে ডারউইন বর্ণবৈষম্যের ইন্ধন দেয়। ডারউইনিজম এমন এক মতাদর্শের ভিত্তি গঠণ করে যা বিকশিত হয়ে বিংশ

শতাব্দীতে পৃথিবীকে রক্তের মধ্যে টেনে নামায় --- তা হলো নাৎসীবাদ।

নাৎসীবাদের মধ্যে ডারউইনিজমের জোরালো প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এডলফ হিটলার ও আলফ্রেড রোজেনবার্গ যে নাৎসী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করে , তা পরীক্ষা করার সময় একজন এ সব ধারণা দেখবে যেমন : ‘ প্রকৃতির নির্বাচন ’ (natural selection) , নির্বাচিত প্রজনন সঙ্গী (selective mating), ‘ প্রজাতিসমুহের মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রাম (the struggle for survival between the races) । এই সব ধারণাগুলি বারবার ডারউইনের তত্ত্বে বলা হয়েছে।

হিটলার তার ‘ আমার সংগ্রাম (*Mein Kampf*) বইটি রচনার সময় ডারউইনের ‘ বেঁচে থাকার সংগ্রাম ’ ও ‘ যে শ্রেষ্ঠতর সেই বিজয়ী হবে ’ এইসব নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়। হিটলার বিশেষভাবে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মধ্যে সংগ্রামের উপর গুরুত্ব দেয় ; ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল ও তুলনাহীন এক স্বর্ণযুগ সাম্রাজ্যের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছাবে যার ভিত্তি হবে নতুন এক জাতিগত কর্তৃত্ব ; এটা প্রকৃতির নিজেরই ঠিক করে দেয়া ভাগ্য (টীকা ৩৩)।

১৯৩৩ সালে নুরেমবার্গের এক দলীয় সভায় হিটলার ঘোষণা করে , ‘ শ্রেষ্ঠতর জাতি তার থেকে নীচু জাতিকে অধীনস্থ করবে ----এটি আমরা প্রকৃতিতে দেখতে পাই এবং এটিকে একটি একক অধিকার হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে(টীকা ৩৪)।

নাৎসীরা যে ডারউইনের মতবাদে প্রভাবিত হয়েছিল এটা এমন এমন এক সত্য যা বলতে গেলে বেশীরভাগ ইতিহাসবিদই যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁরা স্বীকার করেছেন। *The Rise of Fascism* (ফ্যাসীবাদীবাদের উত্থান) বইয়ের লেখক পিটার ক্রিসপ এই সত্যকে এভাবে প্রকাশ করেছেন : বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে ---চার্লস ডারউইনের এই তত্ত্ব প্রথমে যখন প্রকাশিত হয় তখন তা ঠাট্টা-তামাশার শিকার হয় কিন্তু পরে এটাই ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। নাৎসীরা ডারউইনের মতকে বিকৃত করে যুদ্ধ ও বর্ণবৈষম্যকে বৈধতা দিতে এই মতবাদকে ব্যবহার করে (টীকা ৩৫)।

হিটলারের উপর ডারউইনের প্রভাব সম্পর্কে ঐতিহাসিক হিকম্যান বর্ণনা করেন : (হিটলার) ছিল বিবর্তনবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী ও এই মতকে সে প্রচার করতো। তার মানসিক চরিত্র যত দুর্ভেদ্য , গভীর বা দুর্বোধ্য হোক না কেন , এটা নিশ্চিত যে { সংগ্রামের তত্ত্ব ছিল গুরুত্বপূর্ণ কেননা } হিটলার তার বই গবরহ কধসঢ়ভ এ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রাণের বিকাশ সংক্রান্ত বিবর্তন মতবাদ নিয়ে তার কিছু ধারণা উল্লেখ করেন --- বিশেষ করে যেগুলি সংগ্রামের উপর গুরুত্ব দেয় যেমন ‘ যে শ্রেষ্ঠ সেই টিকে থাকবে ’ এবং দুর্বলের অপসারন করে উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা .....(টীকা ৩৬) ।

হিটলার এইসব মতবাদ নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং পৃথিবীকে জোর করে এমন সন্ত্রাসের মধ্যে টেনে নামায় যেমনটি আগে কখনো দেখা যায় নি। অনেক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলসমূহ বিশেষ করে ইয়াহুদী রা নাৎসী ক্যাম্পে সাংঘাতিক নির্মমতার এবং নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের শিকার হয়। নাৎসী অভিযানের সাথে সাথে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় , তাতে ৫৫ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়। বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম করুণ এই ঘটনার পেছনের কারন হলো ডারউইনের ‘ বেঁচে থাকার সংগ্রাম তত্ত্ব ’ ।

একটি রক্তাক্ত জুটি : ডারউইনিজম ও কমিউনিজম:

সামাজিক ডারউইনিজমের ডানপন্থী দলে ফ্যাসীবাদীদের দেখতে পাওয়া যায় ; আর বামপন্থী দলটি হলো কমিউনিস্টদের দখলে। এরা ডারউইন মতের সবচেয়ে রাগী ও হিংস্র সমর্থকদের মধ্যে অন্যতম। ডারউইনিজম ও কমিউনিজমের মধ্যে যে সম্পর্ক তার মূলে রয়েছে এই দুই ‘ মতবাদের ’ প্রবর্তকরা। ডারউইনের ঞযব ঙৎরমরহ ড়ভ ঝঢ়বপরবং (প্রজাতির সূচনা) মতবাদটি প্রকাশের সাথে সাথেই কমিউনিজমের প্রবক্তাদ্বয় মার্কস ও এঙ্গেলস এই মতটি পড়ে ও এর মধ্যে ভোগবাদী দ্বান্দ্বিক
বস্তবাদের মানসিকতা দেখে অভিভূত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস এর মধ্যে যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয় তাতে দেখা যায় , এই দুজনেই ডারউইনের তত্ত্ব সম্পর্কে মনে করেছিলেন যে , ‘ কমিউনিজমের প্রধান উপাদান এতে রয়েছে ’।

ডারউইনের মতে প্রভাবিত এঙ্গেলস তার The Dialectics of Nature (প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক বস্তবাদ) বইতে ডারউইনের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন ; এবং ‘ÔThe Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man.” তত্ত্বে নিজেও কিছু অবদান রাখার

চেষ্টা করেন। যে সব রুশ কমিউনিস্ট মার্কস ও এঙ্গেলস এর অনুসারী ছিল যেমন চষবশযধহড়া, লেনিন, ট্রটস্কি ও স্ট্যালিন ----এরা সবাই ডারউইনের বিবর্তনবাদ মতের সাথে একমত ছিলেন। Plekhanov , যাকে রুশ সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তিনি মার্কসবাদকে বিবেচনা করতেন ‘ সমাজ বিজ্ঞানে ডারউইনিজমের প্রয়োগ ’ হিসাবে (টীকা ৩৭) ।

ট্রটস্কি বলেন , প্রাণীজগতের দেহযন্ত্র বিষয়ক ভূবনে ডারউইনের ‘দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ’ এর আবিষ্কার হলো সবচেয়ে বড় সাফল্য (টীকা ৩৮)।

কমিউনিষ্ট দলের সদস্যদের তৈরী করতে ডারউইনিজমের শিক্ষা একটি বড় ভূমিকা পালন করে। যেমন , ইতিহাসবিদরা এই সত্য তুলে ধরেন যে স্ট্যালিন তরুণ বয়সে ধার্মিক ছিল ; কিন্তু পরে মূলত: ডারউইনের বইয়ের প্রভাবে সে নাস্তিক হয়ে পড়ে। চীনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তি হলো মাও । সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে ‘ চীনা সমাজতন্ত্র ডারউইন ও তার বিবর্তনবাদ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত ’’ (টীকা ৩৯) ।

মাওয়ের উপর ডারউইনিজমের প্রভাব সম্পর্কে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ জেমস রিভ পুশে তাঁর গবেষণামুলক বই *ঈযরহধ ধহফ ঈযধৎষবং উধৎরিহএ* বিস্তারিত লিখেছেন । সংক্ষেপে বিবর্তনবাদ মত ও কমিউনিজমের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিবর্তনবাদ দাবী করে যে জীবন্ত প্রাণীর সৃষ্টি হলো এক আকস্মিক ঘটনা এবং এই তত্ত্ব নাস্তিকতার পক্ষে তথাকথিত বিজ্ঞানভিত্তিক সমর্থন দেয়।

কমিউনিজম হলো এক নাস্তিক মতাদর্শ ; তাই এই মত ডারউইনিজমের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এছাড়াও , বিবর্তনবাদ তত্ত্ব এটাই প্রস্তাব করে যে , প্রকৃতিতে যে দ্বন্দ্ব (অন্য ভাষায় ‘ বেঁচে থাকার সংগ্রাম ’) রয়েছে তার জন্যই প্রকৃতিতে উন্নয়ন সম্ভব হয় , সেজন্য প্রকৃতির এই দ্বন্দ্ব ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এই তত্ত্ব কমিউনিজমের মূল ভিত্তি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (“dialectics”) মতকে সমর্থন করে। আমরা যদি কমিউনিষ্ট মত ‘ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ’ এর কথা চিন্তা করি যা একটি ‘ হত্যাকারী যন্ত্র ’ হিসাবে বিংশ শতাব্দীতে ১২০ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছে ; তাহলে আমরা আরো

ভালভাবে বুঝতে পারবো ডারউইনিজম এই পৃথিবীতে কিভাবে নানামাত্রায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সমাজে উন্নয়নকে লালন করে না , বরং একে ধ্বংস করে:

আমরা আগেই জেনেছি ডারউইনিজম প্রস্তাব করে যে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব হলো তাদের উন্নয়ণের কারণ এবং এই মতের পক্ষে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমর্থনও এই তত্ত্ব অর্জন করেছে। নামেই বোঝা যায় যে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তি হলো ‘ সংঘাত ’। কার্ল মার্কস , এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এই মত প্রচার করে যে ‘‘ যদি সংঘাত ও বিরোধিতা না থাকতো , তাহলে সব কিছুই যেমন অবস্থায় ছিল তেমনই থাকতো । ’’ অন্য এক জায়গায় মার্কস বলে , ‘ শক্তি হলো যে কোন পুরানো সমাজের জন্য ধাত্রীস্বরূপ; যা নতুন সন্তানের জন্মে সাহায্য করে ’ (টীকা ৪০) । এই কথা বলে তথাকথিত উন্নতির জন্য মানুষকে সন্ত্রাস , যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের জন্য মার্কস উৎসাহ দেয় ।

লেনিন প্রথম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কসের তত্ত্ব প্রয়োগ করে। বিরোধীদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে উন্নতি হয় ’ এই মতকে লালন করে লেনিন উৎসাহ দেয় যে বিপরীত মতের মানুষদের মধ্যে সবসময় অবশ্যই দ্বন্দ্ব -সংঘাত থাকবে। লেনিন বারবার বলে যে এই দ্বন্দ্বের জন্য প্রয়োজন রক্তক্ষয় ; যা হলো সন্ত্রাস। লেনিনের একটি রচনা Guerrilla Warfare (গেরিলাদের যুদ্ধ) যা ১৯০৬ সালে বলশেভিক বিপ্লবের এগারো বছর আগে *Proletary* তে প্রথম প্রকাশিত হয় ; তাতে সন্ত্রাসের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় : যে বিষয়ে আমরা আগ্রহী তাহলো সশস্ত্র সংগ্রাম; এটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং ছোট্ট ছোট্ট দল দিয়ে পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে কেউ বিপ্লবী দলের সদস্য , আবার কেউ (রাশিয়ার কিছু এলাকার অধিকাংশই) বিপ্লবী দলের সদস্য নয়।

সশস্ত্র আন্দোলন চালানো হয় দুইটি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে যেগুলিকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবেই চিহ্নিত করা উচিৎ। প্রথমত: এই সংগ্রামের লক্ষ্য হলো মানুষদের যেমন সেনাবাহিনী ও পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা ও তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা , কর্মচারীদেরকে খুন ; দ্বিতীয়ত: সরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ের অর্থ লুট করা। এই অর্থের কিছুটা যায় দলীয় ফান্ডে ; কিছু খরচ হয়

সশস্ত্র আন্দোলনের প্রশিক্ষণ ও সেগুলির বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ পূরণে ; কিছু অর্থ করচ হয় যে সংগ্রামের কথা আমরা বলছি তার সাথে জড়িতদের খরচ মেটাতে (টীকা ৪১)।

বিংশ শতাব্দীতে কমিউনিষ্ট বিরোধী মতাদর্শের মধ্যে ফ্যাসীবাদী মত ছিল বহুল প্রচারিত। মজার ব্যপার হলো , যদিও ফ্যাসীবাদ ঘোষণা করে যে এটা কমিউনিষ্ট বিরোধী , এই মত কিন্তু কমিউনিষ্ট আদর্শের মতই সংগ্রামে বিশ্বাস করতো। কমিউনিষ্টরা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল এবং ফ্যাসিবাদীরা শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটি বদলে বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংগ্রামের ধারণাটি গ্রহণ করে। যেমন , কুখ্যাত বর্ণবিদ্বেষী ও নাৎসী ধারণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র জার্মান ইতিহাসবিদ Heirnich Treitschke লেখেন , তীব্র প্রতিযোগিতা ছাড়া জাতিগুলির পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয় ; যেমনটি হয় ডারউইনের জীবন সংগ্রামে (টীকা ৪২) ।

হিটলারও এটাই বলে যে , ডারউইনের সংগ্রামের মত থেকেই তিনি উৎসাহ পেয়েছেন : পুরো পৃথিবী জুড়েই প্রকৃতিতে শক্তিশালী ও দূর্বলের মধ্যে শক্তির লড়াই চলছে ----দূর্বলের উপর সবলের অন্তহীন বিজয় ঘটছে। এই সংগ্রাম না থাকলে প্রকৃতিতে কেবল অবনতিই ঘটবে। যে বাঁচতে চায় তাকে যুদ্ধ করতে হবে। এই পৃথিবীতে প্রকৃতির আইন এটাই যে সংগ্রাম চলতেই থাকবে । তাই যে যুদ্ধ করতে চায় না তবে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই (টীকা ৪৩)।

এই দুই ডারউইনভিত্তিক সামাজিক আদর্শগত মতবাদ বিশ্বাস করে যে , একটি সমাজকে শক্তিশালী করতে সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয় অপরিহার্য। এরা বিংশ শতাব্দীতে যা করেছে তা সবাই জানে। অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ মারা গিয়েছে ; আরো অনেক মানুষ হয় আহত অথবা বিকলাঙ্গ হয় ; দেশে দেশে জাতীয় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে ; যে টাকা-পয়সা আগে খরচ করা হতো স্বাস্থ্য , গবেষণা , প্রযুক্তি , শিক্ষা ও শিল্পকলাতে -----সেই টাকা এখন খরচ করা হলো অস্ত্র কিনতে , ক্রয় করা অস্ত্রের আঘাতে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে বাধার জন্য ব্যান্ডেজ কিনতে ও এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে।

সময়ের সাথে এটা প্রমাণিত হলো যে সংগ্রাম ও সন্ত্রাস মানুষের উন্নয়নের জন্য সহায়ক নয় বরং এটা ধ্বংসকারী।

অবশ্যই এই পৃথিবীতে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। যেমনটি প্রকৃতিতে রয়েছে আলো ও অন্ধকার , দিন ও রাত , গরম ও ঠান্ডা ; তেমনি বিভিন্ন মতের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা থাকবে। কিন্তু ভিন্ন মত থাকলেই সংঘাত অপরিহার্য নয়। বরং

এর বিপরীতে বলা যায় , যদি ভিন্ন মতকে গ্রহণ করা হয় সহনশীলতা , শান্তি , সমঝোতা , ভালবাসা , সহানুভূতি ও ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে , তাহলে ভাল প্রতিক্রিয়া পাওয়া সম্ভব। প্রত্যেকে যদি নিজের মতকে অন্য মতের সাথে তুলনা করে তাহলে সে নিজের মতের দোষ–ত্রুটিগুলি সংশোধন করে নিজের আদর্শকে আরো উন্নত করতে পারবে। যারা ভিন্নমতকে, সমর্থন করে তারা ও পরস্পরের মধ্যে ভাব–বিনিময় করতে পারে ও গঠনমুলক সমালোচনা করতে পারে।

শুধুমাত্র আন্তরিক , ক্ষমাশীল , শান্তিপ্রিয় ও ভদ্র ব্যক্তি যে কিনা পবিত্র কুরআনের নৈতিক শিক্ষাকে মেনে চলে , সে এই মানসিকতা দেখাতে পারে। একজনকে খুন করে ফেলো বা তার ক্ষতি করো শুধুমাত্র এই কারণে যে সে ভিন্ন মত পোষণ করে বা ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী অথবা সে ভিন্ন জাতির ––––এটা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা।

শুধুমাত্র এই কারণে ইতিহাসের পাতায় ও পুরো বিশ্বে আমরা দেখি যে একই দেশের নারী ও পুরুষেরা একে অন্যের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম করছে , অন্যকে খুন করছে কোন দয়া–মায়া না দেখিয়ে অথবা অন্য জাতি বা দেশের মানুষকে নারী ও শিশুদেরকেসহ নির্বিচারে খুন করা হচ্ছে। এমনটি করা তার পক্ষেই সম্ভব যার মনে অন্য মানুষ সম্পর্কে কোনরকম শ্রদ্ধা নেই এবং তার সামনে উপস্থিত একজনকে যে শুধুমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী হিসাবে বিবেচনা করছে ; এ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে বিশ্বাস করে না যে তাকে স্রষ্টার কাছে নিজের প্রতিটি কাজের জন্য দায়ী থাকতে হবে। ভিন্ন মতের প্রতি সঠিক ও সেরা মনোভাব কী তা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে।

ভিন্ন মতের মানুষদের মধ্যে নানা সংঘর্ষের কাহিনী ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই ; এর মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত উদাহরণ হলো হযরত মুসা (আ:) ও তার সময়কার ফেরাউনের মতবিরোধ । ফেরাউনের সব ধরণের নিষ্ঠুরতা ও আগ্রাসনের পরেও মুসা (আ:) কে আল্লাহ ফেরাউনের কাছে পাঠালেন স্রষ্টার ধর্মের প্রতি দাওয়াত দিতে ।

মুসা (আ:) আল্লাহ’র আদেশ পালন করেন ও ফেরাউনের কাছে বিস্তারিত সত্য ধর্মকে ব্যাখ্যা করেন। ফেরাউন স্রষ্টাকে অস্বীকার করে এবং মানুষের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে–––এসব বন্ধ করার জন্য মুসা (আ:) অত্যন্ত ধৈর্যের

সাথে সব কিছু ফেরাউনের কাছে ব্যাখ্যা করেন। ফেরাউন অবশ্য শত্রুতামুলক মনোভাব দেখায় হযরত মুসা (আ:) এর পবিত্র চরিত্র ও ধৈর্যশীল মানসিকতার প্রতি , খুন করার হুমকি দেয় তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের মানসিকতার জয় হয় নি। বরং সে ও তার দলবল পানিতে ডুবে যায়। মুসা (আ:) ও তাঁর অনুসারীরাই বিজয়ী হয়। এই উদাহরণ এটাই শেখায় যে , শত্রুতা বা আগ্রাসন দিয়ে কোন আদর্শের জয় বা উন্নয়নের সংগ্রাম সফল হয় না।

হযরত মুসা (আ:) ও ফেরাউনের সাক্ষাত আমাদেরকে ইতিহাস থেকে এটাই শিক্ষা দেয় যে: যারা ঝগড়া-বিবাদ ও নিষ্ঠুরতা করে তারা জয়ী হয় না কিন্তু যারা শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে , তারাই প্রকৃত জয়ী। দুনিয়ার জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী অনন্তকালের জীবন -----এই দুই জায়গাতেই চমৎকার নৈতিক আচরণের পুরস্কার মানুষ পায়।

ডারউইনিজম ও সন্ত্রাস:

আমরা এ পর্যন্ত যা দেখলাম , সন্ত্রাসমূলক বিভিন্ন আদর্শের মুলে রয়েছে ডারউইনিজম যার ফলে বিংশ শতাব্দীতে মানবজাতিকে নানা বিপর্যয়ের মধ্যে যেতে হয়েছে । এই মতবাদ ও উপলব্ধির ভিত্তি হলো ‘‘ যে আমার দলের না সে যেই হোক না কেন , তার সাথে যুদ্ধ করো। ’’

এই পৃথিবীতে বিভিন্ন বিশ্বাস , দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শন রয়েছে এটা খুবই স্বাভাবিক যে , এই বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে পার্থক্য থাকবে , একে অন্যের বিপরীত মতে অবস্থান করবে। এই মতপার্থক্যকে নীচে উল্লেখিত দুইটি উপায়ের মধ্যে কোন একভাবে মোকাবেলা করা যায় : ১। তারা অন্য মতকে শ্রদ্ধা করবে যদিও অন্যপক্ষ তাঁদের মতো নয় এবং অন্য মতের মানুষদের সাথে তাঁরা সংলাপে যাবে; মানবিক কোন উপায় অবলাম্বন করবে। অবশ্যই , এই পদ্ধতি কুরআনের নীতিমালার অনুসারী।
২। তারা অন্য পক্ষের সাথে সংঘর্ষে যাবে এবং তাদের ক্ষতি করে নিজেদের সুবিধা নিশ্চিত করবে। অন্য ভাষায় বলা যায় , হিংস্র জন্তুর মতো আচরণ করবে। বস্তুবাদী মনোভাব এই পদ্ধতি অনুসরণ করে , ধর্মের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তীব্র ভয় ও আতংক যাকে আমরা ‘ সন্ত্রাস ’ বলি তা আর কিছুই নয় বরং দ্বিতীয় মতের প্রকাশ।

আমরা যখন এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের কথা চিন্তা করি , তখন দেখি যে , ‘ মানুষ হচ্ছে যুদ্ধবাজ প্রাণী ’’ এই ধারণাটি

ডারউইনের তত্ত্ব মানুষের অবচেতন মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে যা খুবই প্রভাব বিস্তারকারী , ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে যারা এই সংঘাতের পথকে বেছে নিয়েছে তারা হয়তো কখনো ডারউইনিজম ও এই আদর্শের নীতি সম্পর্কে কিছু শোনে নি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা এমন এক মতকে সমর্থন করে যার আদর্শের ভিত্তি হলো ডারউইনিজম ।

তাদের পছন্দের আদর্শ তাদেরকে পরিচালিত করে নিয়ে যায় সেই বিশ্বাসের দিকে যার মূলে রয়েছে ডারউইনিজমমূলক শ্লোগানসমূহ যেমন : ‘‘ এই পৃথিবীতে যে শক্তিশালী সেই টিঁকে থাকবে ’’ , ‘‘ বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে ফেলে ’’, ‘‘ যুদ্ধ মহান ’’ ও ‘‘ যুদ্ধের মাধ্যমে মানুষ উন্নতির পথে এগিয়ে যায় ’’। ডারউইনিজমকে সরিয়ে ফেললে এসব শ্লোগান একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়ে।

সত্যিকার অর্থে , ডারউইনিজম না থাকলে কোন সংঘাতের দর্শনই থাকে না। যে তিনটি ঐশ্বরিক ধর্মে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে যেমন ইসলাম , খৃস্টধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্ম----এই তিনটিই সন্ত্রাসের বিরোধী । এই তিন ধর্মই পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্য আনতে চায় এবং নিরপরাধ মানুষকে হত্যা , নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বিরোধী । সংঘাত ও সন্ত্রাস মানুষের জন্য আল্লাহ’র নির্ধারিত নীতিমালাকে লঙ্ঘন করে এবং এটা হলো অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্খিত মতবাদসমূহ। অবশ্য , ডারউইনিজম দ্বন্দ্ব ও সন্ত্রাসকে চিহ্নিত করে স্বাভাবিক , ন্যায় ও সঠিক মত হিসাবে যার অস্তিত্ব অপরিহার্য।

এজন্য যদি কিছু মানুষ ইসলাম , খৃস্ট ও ইয়াহূদী ধর্মের নামে ও ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করে সন্ত্রাস করে তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন যে এরা আসলে মুসলমান , খৃস্টান অথবা ইয়াহূদী নয় ।

এরা হচ্ছে সত্যিকারের ডারউইনপন্থী , তারা ধর্মের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে , এরা সত্যিকারের বিশ্বাসী নয়। যদিও এরা দাবী করে যে তারা ধর্মের পথে কাজ করছে , তারা আসলে ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসীদের শত্রু। কারণ , এরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে এমন অপরাধ করছে যা ধর্মে নিষিদ্ধ ; এবং মানুষের কাছে ধর্মকে খারাপ হিসাবে তুলে ধরছে । এজন্য মহামারীর মতো পৃথিবীতে যে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে তার উৎস কোন ঐশ্বরিক পবিত্র ধর্ম নয় বরং নাস্তিকতায় এবং আমাদের সময়ে নাস্তিকতার প্রকাশ হলো ডারউইনিজম ও বস্তবাদিতায়।

শান্তিপ্রিয় প্রতিটি মানুষের অবশ্যই ডারউইনিজমের বিপদকে চিনতে হবে:

কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে তার মূলে যেতে হবে। যেমন , ময়লা–আবর্জনায় ভর্তি ডাস্টবিনের চারপাশ পরিষ্কার রাখতে একজন যতই চেষ্টা করুক না কেন , দুর্গন্ধ দূর হবে না। সব সমাধানই দেখা যাবে ক্ষণস্থায়ী ।

সব ময়লা সরিয়ে ফেলার মধ্যেই রয়েছে সত্যিকারের সমাধান। অন্যভাবে বলা যায় , এটা অনেকটা এরকম: বছরের পর বছর কেউ বিষধর সাপকে লালন–পালন করে মানুষের মধ্যে ছেড়ে দিল ; এরপর সে অবাক হয়ে ভাবে , কেন এই সাপগুলো মানুষকে কামড়াচ্ছে ? তখন আবার সেই সাপগুলিকে ধরে আনার চেষ্টা করা হলো। এক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ হলো , বিষাক্ত সাপকে লালন–পালন করা যাবে না।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলছে , তাতে একজন একজন করে সন্ত্রাসীকে খুঁজে বের করে তাকে ব্যর্থ করার চেষ্টা স্থায়ী ও সফল কোন সমাধান নয়। এই পৃথিবীর বুক থেকে সন্ত্রাসকে সমূলে দূর করার একমাত্র পথ হলো সন্ত্রাসীদেরকে লালন করছে যে তার উৎস খুঁজে বের করা ও তাকে সরিয়ে ফেলা।

সন্ত্রাসের মূল উৎস হলো ভুল মতাদর্শ ও এসব ভুল আদর্শের ভিত্তিতে দেয়া শিক্ষা। বলতে গেলে বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই স্কুল পাঠ্যসূচীতে ডারউইনিজমকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং একে একটি বৈজ্ঞানিক মত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ছোট বাচ্চাদেরকে এটা শেখানো হয় না যে , আল্লাহ তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন; জন্মসূত্রেই তাঁরা নৈতিকতা , মানবিকতা , জ্ঞান ও বুদ্ধি–বিবেচনা লাভ করেছে। তাঁদেরকে বলা হয় না , শেষ বিচারের দিনে তাঁদেরকে নিজ নিজ কাজের জন্য স্রষ্টার কাছে দায়ী হতে হবে এবং খারাপ কাজের শাস্তি হিসাবে দোযখ ভাল কাজের পুরষ্কার হিসাবে বেহেশতে তাঁরা চিরকাল থাকবে। বরং তাঁদেরকে শেখানো হয় যে , তাঁরা এমন এক সৃষ্টি যাদের পূর্বপুরষরা ছিল জন্তু। নানা এলোমেলো আকস্মিক যোগাযোগের সূত্র ধরে এই পৃথিবীতে তাঁদের অস্তিত্ব বিরাজমান। এ ধরনের বিশ্বাস ছোটবেলা থেকেই তাঁদের মনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।

বাচ্চারা এটাই মনে করে যে তারা আকস্মিক ঘটনাক্রমে এই পৃথিবীতে এসেছে এবং আল্লাহ’র কাছে তাই তারা দায়ী হবে না। নিজেদের ভবিষ্যত––––যা হচ্ছে তাঁদের জন্য অস্তিত্বের প্রশ্ন––সেখানে তাঁদেরকে বিজয়ী হতে হবে সংগ্রামের মধ্য

দিয়ে। এই পর্যায় পার হওয়ার পর এদের মগজ ধোলাই করা মানবতার শত্রুতে পরিণত করা খুবই সহজ কাজ হয়ে পড়ে ; কারণ এরা তাদের পুরো স্কুল জীবনে আগেই এ সব বিশ্বাসে মনকে পূর্ণ করেছে---তাই নিরপরাধ শিশুদের হত্যা করার মতো নিষ্ঠুর হওয়া এদের পক্ষে সহজ।

এ কিশোর-তরুণরা স্বতস্ফূর্তভাবে এসব বিপথগামী আদর্শের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে ; তারা সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণাধীন পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে কাজ করতে পারে এবং অবিশ্বাস্য রকমের নিষ্ঠুর ও সন্ত্রাসমূলক কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

উনবিংশ শতাব্দীতে অস্তিত্ব লাভ করা বিভিন্ন কমিউনিষ্ট , ফ্যাসিবাদী ও বর্ণবাদী দলগুলি হলো এ সব শিক্ষা ব্যবস্থার ফসল। দ্বিতীয় যে ক্ষতি এই শিক্ষা পদ্ধতি করে সেটা হলো ধর্ম থেকে পুরো শিক্ষাকে অনেক দূরে নিয়ে যায় ; ফলে ধর্মের প্রভাব শুধুমাত্র অশিক্ষিত মানুষদের উপর কাজ করে। এভাবে , যাদের শিক্ষার জগতে প্রবেশের সুযোগ আছে তাঁরা পুরোপুরিভাবে ধর্ম থেকে দূরে থাকে । ডারউইনজম-বস্তুবাদী ভাবধারাগুলিই এজন্য দায়ী। ফলে ধর্ম থাকে শুধুমাত্র অশিক্ষিতদের খপ্পরে।

এর ফলে বিভিন্ন কূ-সংস্কার ও ভুল ধারণার প্রসার ঘটে । ধর্মের নামে ধর্ম বিরোধী এসব মতের প্রসার যারা ঘটায় তাদের পক্ষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। সেপ্টেম্বর ১১ এর ঘটনাবলী এটার স্পষ্ট উদাহরণ। যে আল্লাহকে ভয় করে , আল্লাহকে ভালবাসে এবং যে মনে করে মৃত্যুর পরে সব কাজের জন্য আল্লাহ'র কাছে দায়ী থাকতে হবে সে কখনোই এমন কাজ করতে পারে না ---যে কাজের ফলে হাজার হাজার মানুষ মারা যায় অথবা আহত হয় এবং হাজার হাজার হাজার শিশু অনাথ হয়।

এমন মানুষ জানে যে , যাদের প্রতি সে নিষ্ঠুরতা করেছে , তাঁদের সবার জন্যই আল্লাহ'র কাছে সে দায়ী থাকবে এবং প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্থ মানুষই তার জন্য দোযখের নিদারুণ শাস্তির কারণ হবে। উপসংহারে বলা যায় , সন্ত্রাসী কাজ বন্ধ করতে হলে ডারউইনিজম-বস্তুবাদ শিক্ষার সমাপ্তি টানতে হবে; ছোট বাচ্চাদেরকে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে যে শিক্ষা তা দিতে হবে এবং বাচ্চাদের মনে আল্লাহ'র ভয় ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করতে হবে এবং তাদের

মনে এই ইচ্ছা জাগাতে হবে যে , বুদ্ধি ও বিবেকের প্রয়োগ ঘটিয়ে কাজ করতে হবে। এই ধরণের শিক্ষার ফসল হবে এমন একদল মানুষ যারা হবে শান্তিপ্রিয় , বিশ্বাসী , ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।

[বিবর্তনবাদ নিয়ে আগের অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নীচে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো]

বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা :

" তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে । তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে দয়াময় আল্লাহ'র সৃষ্টিতে। আবার ফিরাও দৃষ্টি , কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি ? (সুরা মুলক; ৬৭ : ৩)

এই মহাবিশ্বের সব কিছুই এক শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টির দিকে নির্দেশনা দেয়। অন্যদিকে , বস্তুবাদিতা মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্বকে অস্বীকার করে যা আর কিছুই নয় , বরং এক অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। বস্তুবাদী মতবাদ যখন বাতিল হয়ে যায় , তখন এই আদর্শের উপর গড়ে উঠা অন্য সব মতবাদ ভিত্তিহীন হয়ে যায়। সবচেয়ে প্রথমেই আসে ডারউইনিজমের কথা অর্থাৎ বিবর্তনবাদের তত্ত্ব। এই মতে দাবী করা হয় -- কেবল ঘটনাচক্রেই জড়জগত থেকে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন -- এই স্বীকৃতির সাথে সাথেই এই তত্ত্ব মিথ্যা হয়ে যায় নক্ষত্রের রাসায়নিক ও পদার্থতত্ত্ববিদ Hugh Ross ব্যাখ্যা করে বলেন , নাস্তিকতা , ডারউইনিজম ও অন্যান্য সব মতবাদের উৎপত্তি হয় ১৮ শ' থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে । এই সময়ের মধ্যে যে সব দার্শনিক মত গড়ে উঠেছিল , সে সবকে সত্য বলে ধরে নেয়া হয়েছিল ; ভুলভাবে মনে করা হয়েছিল যে মহাবিশ্ব হচ্ছে অসীম। এই মহাবিশ্বসহ প্রাণের সৃষ্টির পিছনে যে যুক্তি রয়েছে , অভূতপুর্ব উপায়ে আমরা তার মুখোমুখি হই (Hugh Ross, *The Fingerprint of God*, p. 50)

তিনিই আল্লাহ যিনি এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকেও সুন্দরভাবে বানিয়েছেন। সেজন্য বিবর্তনবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী জীবন্ত প্রাণী আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট হয় নি বরং ঘটনাচক্রে সৃষ্ট--- এটা অসম্ভব । এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে , আমরা যখন বিবর্তন মতের দিকে তাকাই , তখন দেখি এই মত বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণাদিকে প্রত্যাখ্যান করছে। জীবনের নক্‌শা খুবই জটিল ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। জীবনের এই অভূতপূর্ব নক্‌শা বিংশ শতাব্দীর শেষে ডারউইনের মতকে অবৈধ করে দেয়।

আমাদের কিছু বইতে এই বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং ইনশা আল্লাহ ভবিষ্যতেও করবো। আমরা মনে করি , এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটি সংক্ষিপ্ত সারমর্ম এখানে প্রদান করলে তা অনেকের উপকারে আসবে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে ডারউইনিজমের পতন:

যদিও এই মতবাদের উদ্ভব সেই প্রাচীন গ্রীস থেকে ; বিবর্তনবাদের তত্ত্ব মুলত: জোরদার প্রচার পায় ১৯ শতাব্দীতে এসে। এই মত নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয় যখন ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইনের *"The Origin of Species"* বইটি প্রকাশিত হয়। এর পরপরই বিজ্ঞানের জগতে এই মতবাদ আলোচনার শীর্ষে চলে আসে।

এই বইতে ডারউইন অস্বীকার করেন যে আল্লাহ বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণীকে আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন। ডারউইনের মতে , সব জীবন্ত প্রাণীর পুর্ব-পুরুষ একই এবং পরে কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্র্য এসেছে।

ডারউইনের মতবাদ কোন জোরালো বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণাদির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি নিজেও এটা স্বীকার করেন যে , এসবই কেবল ‘ অনুমান ’। এছাড়াও , তার বইয়ের একটি দীর্ঘ অধ্যায় Difficulties of the Theory তে ডারউইন স্বীকার করেন যে , অনেক জটিল প্রশ্নের মুখে এই তত্ত্ব ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কারের উপর ডারউইন তার সব আশা - ভরসা অর্পণ করেন । তিনি আশা করেন যে , নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এই মতবাদের সমস্যাগুলির সমাধান বেরিয়ে আসবে। যদিও দেখা গেল , নতুন বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি তার আশার ঠিক উল্টো কাজটি ঘটালো। সমস্যার বহুমাত্রিক জটিলতা বরং বৃদ্ধি পেল। বৈজ্ঞানিকভাবে ডারউইন যে ব্যর্থ , তা তিনভাবে পর্যালোচনা করা যায়।

১। এই তত্ত্ব কোনভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারে না , কিভাবে এই পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হলো ?

২। সৃষ্টির পিছনে বৈপ্লবিক যে কৌশলের দাবী এই মত করে , বৈজ্ঞানিক কোন তথ্যাদি এমনটি প্রমাণ করে না যে , এভাবে প্রাণের বিকাশ সম্ভব।

৩। জীবাশ্ম (ফসিলের) রেকর্ড বিবর্তনবাদের দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত মতটিই প্রমাণ করে। এই বিভাগে আমরা এই তিনটি মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

জীবনের উৎপত্তি:

বিবর্তনবাদীরা দাবী করে যে আজ থেকে ৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে আদিম পৃথিবীতে একটি মাত্র জীবকোষ থেকে সব জীবন্ত প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। এই মত অবশ্য উত্তর দিতে পারে না যে , কিভাবে এককোষী সেল থেকে লক্ষ-কোটি বহুকোষি প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব ? আর যদিও বা সত্যি সত্যি এভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে , তবে কেন জীবাশ্মের রেকর্ডে এর কোন প্রমাণ নেই ? প্রথমেই বলা যায় , এই তথাকথিত বিবর্তনবাদের প্রক্রিয়ায় প্রথম কোষ কিভাবে আসলো ? যেহেতু বিবর্তনবাদ সৃষ্টিকে অস্বীকার করে এবং কোন অতি-প্রাকৃতিক বিষয়কে স্বীকার করে না ; এরা মনে করে ঘটনাচক্রে প্রথম কোষের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে থেকেই-- কোনরকম নক্শা পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা ছাড়াই।

এই মতবাদ অনুসারে প্রাণহীন অবস্থা থেকে ঘটনাচক্রে জীবন্ত কোষের উদ্ভব ঘটে। এটি অবশ্য জীববিজ্ঞানের কোন নিয়মের সাথেই সঙ্গাতিপূর্ণ নয়।

জীবন থেকে জীবন এসেছে :

ডারউইন তার বইতে কখনোই জীবনের উৎপত্তি ঠিক কিভাবে হলো , তার বিস্তারিত উল্লেখ করেন নি। তার সময়ে বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক যে ধারণা তার ভিত্তি ছিল এই যে , জীবন্ত প্রাণীর কাঠামো খুবই সহজ-সরল। মধ্যযুগে (পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী) আরেকটি তত্ত্ব বলা হলো -- spontaneous generation (নিজে থেকে সৃষ্ট)। এই মত অনুমান করে যে , বিভিন্ন জড়পদার্থের নানা উপকরণ থেকে জীবকোষের সৃষ্টি হয়েছে ---এই মত বিপুলভাবে গৃহীত হয়। সাধারণভাবে মনে করা হলো যে , পোকা-মাকড় এসেছে খাদ্যের উচ্ছিষ্ট থেকে , ইঁদুর এসেছে গম থেকে ইত্যাদি। এই মত প্রমাণ করতে আকর্ষণীয় সব পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা হলো । কিছু গম রাখা হলো ময়লা কাপড়ের ভিতরে। আশা করা হলো , কোন ইঁদুর বেরিয়ে আসবে তা থেকে। একইভাবে মাংসের মধ্যে পোকার জন্ম হওয়াকে মনে করা হলো নিজে থেকে জন্মের প্রমাণ হিসাবে। পরে জানা গেল , মাংসের মধ্যে আসলে কীটের জন্ম হয় নি। মাছি এসবকে লার্ভার আকারে বহন করে নিয়ে আসে , যা খালি চোখে দেখা যায় না।

এমন কী , যে সময়ে ডারউইন *The Origin of Species* বই লিখেছিলেন , সে সময় বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপকভাবে এটা বিশ্বাস করা হতো যে , প্রাণহীন বস্ত থেকে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হওয়া সম্ভব। ডারউইনের বই বের হওয়ার পাঁচ বছর পর লুই পাস্তুরের আবিষ্কার এই বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণ করলো যা বিবর্তনবাদের মুল ভিত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দীর্ঘ সময়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণার পর পাস্তুর সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে , প্রাণহীন জড় পদার্থ থেকে প্রাণের বিকাশ সম্ভব , এই দাবীর কবর ইতিহাসে রচিত হলো ভাল’র জন্যই (Sidney Fox, Klaus Dose, *Molecular Evolution and The Origin of Life*, New York: Marcel Dekker, 1977. p. 2)

বিবর্তনবাদের সমর্থকরা দীর্ঘদিন ধরে পাস্তুরের প্রমাণাদির বিরোধিতা করে ; যদিও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে জীবন্ত প্রাণীর জটিল কোষ কাঠামোর ব্যাখ্যা ঘটনাচক্রের প্রাণের সৃষ্টির মতবাদকে আরো বেশী কোণঠাসা করে ফেলে।

বিংশ শতাব্দীর অমীমাংসিত উদ্যোগ :

বিশিষ্ট রুশ জীববিজ্ঞানী আলেকজান্ডার অপারিন প্রথম বিবর্তনবাদী যিনি বিংশ শতাব্দীতে জীবনের উৎপত্তি মতবাদ নিয়ে কাজ করেন। ১৯৩০ সালে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন,ঘটনাচক্রে জীবন্ত প্রাণীর জীবকোষ সৃষ্টি সম্ভব। এই পরীক্ষাগুলি অবশ্য ব্যর্থ হয় এবং অপারিন স্বীকার করেন যে , “ দুর্ভাগ্যক্রমে জীবকোষের উৎপত্তি এমন এক প্রশ্ন হয়ে রয়ে গেল যা প্রকৃতপক্ষে পুরো বিবর্তনবাদের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায় ” (Alexander I. Oparin, *Origin of Life*, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), p.196)

অপারিনের সমর্থক বিবর্তনবাদীরা পরেও প্রাণের উৎপত্তি প্রশ্নের সমাধানে অনেক পরীক্ষা চালিয়ে যান। এ সবের মধ্যে সেরা বিবেচনা করা হয় ১৯৫৩ সালে করা মার্কিন রসায়নবিদ স্ট্যানলী মিলারের পরীক্ষাকে। তিনি দাবী করেন , বিভিন্ন গ্যাসের সমন্বয়ে পরীক্ষাগারে পৃথিবীর আদিম বায়ুমন্ডল তৈরী করা হয় । প্রোটিনের আকারে বেশ কিছু জৈব অণুর অস্তিত্ব ঐ মিশ্রণের মধ্যে পাওয়া যায় । অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকাশ পেল যে , ঐ পরীক্ষা যাকে বিবর্তনবাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে মনে করা হচ্ছিলো -- তা আসলে অবৈধ। সত্যিকারের পৃথিবীর আবহাওয়া থেকে পরীক্ষাগারের কৃত্রিম পরিবেশ ভীষণভাবে আলাদা ছিল । (টীকা ২৭-"New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol 63, November 1982, p. 1328-1330)

দীর্ঘ নীরবতার পর মিলার স্বীকার করেন , আবহাওয়ার মাধ্যম হিসাবে তিনি যা ব্যবহার করেছিলেন , তা বাস্তবসম্মত ছিল না । (Stanley Miller, *Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules*, 1986, p. 7)

পুরো বিংশ শতাব্দী জুড়ে সব বিবর্তনবাদীরা প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। সান ডিয়াগো স্ক্রিপস ইনস্টিটিউটের ভু-রসায়নবিদ জেফরী বাদা এই ব্যর্থতা স্বীকার করে ১৯৯৮ সালে *Earth* ম্যাগাজিনে একটি প্রতিবেদন লিখেন : " পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ কিভাবে ঘটলো ? আজ আমরা যখন বিংশ শতাব্দী পার করে দিচ্ছি ---তখনো আমাদের সামনে এই সবচেয়ে বড় অমীমাংসিত সমস্যাটি তেমনই রয়ে গিয়েছে , ঠিক যেমনটি ছিল আমরা যখন এই শতাব্দীতে প্রবেশ করেছিলাম (Jeffrey Bada, *Earth*, February 1998, p. 40)

প্রাণের জটিল কাঠামো:

প্রাণের বিকাশ নিয়ে বিবর্তনবাদীদের কোণ-ঠাসা অবস্থার প্রাথমিক কারণ হলো , আপাত:দৃষ্টিতে একদমই সাধারণ যে প্রাণী , তারও থাকে অবিশ্বাস্য জটিল কাঠামো । জীবন্ত প্রাণীর জীবকোষ মানুষের তৈরী যে কোন কারিগরী পণ্যের থেকে অনেক বেশী জটিল। আজ বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত পরীক্ষাগার গুলিতেও অজৈব উপাদান দিয়ে জীবন্ত জীবকোষ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। জীবকোষ গঠনের প্রক্রিয়া এত জটিল ও ব্যাপক যে , ঘটনাচক্র বলে তা ব্যাখ্যা করা যাবে না।

প্রাটিন থাকার সম্ভাব্যতা , কোষ নির্মাণের প্রয়োজনীয় ছাঁচ যাকে কোষের অট্টালিকা বানানোর ব্লক বলা হয় --এত কিছুর সমন্বয় ঘটনাচক্রে অসম্ভব। কোন প্রোটিন তৈরী হতে গড়ে দরকার ৫০০ এমিনো এসিডের ---আপনাআপনি এমনটি ঘটার সম্ভাবনা একের পর ৯৫০ বার শূন্য লিখলে যে সংখ্যা পাবো তার মধ্যে মাত্র একবার। অংকের হিসাবে কাগজে - কলমে

একের পর ৫০ বার শূন্য লিখলে যা পাবো সে সংখ্যা থেকে ঘটার সম্ভাবনা কম থাকলে বাস্তবে তা কখনোই ঘটবে না --একেবারেই অসম্ভব ।

কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে ডি এন এ অণু থাকে এবং যাতে জেনেটিক তথ্য আছে তা এক অবিশ্বাস্য তথ্য ভান্ডার। হিসাব করে দেখা গেছে , ডি এন এ'র ভিতরে যে তথ্য থাকে তা যদি লেখার আকারে প্রকাশ করা হয় , তবে একটি বিশাল আকৃতির লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা যাবে যাতে রয়েছে ৯০০ খন্ডের এনসাইক্লোপিডিয়া এবং যার প্রতিটিতে রয়েছে ৫০০ পাতা।

একটি খুব মজার উভয় সংকট সৃষ্টি হয় এই পর্যায়ে। ডি এন এ পরিপূর্ণতা পায় কেবল তখনই যখন নির্দিষ্ট কিছু প্রোটিন (এনযাইম) উপস্থিত থাকে , আবার ডি এন এর মধ্যে সংরক্ষিত তথ্যাদির সমন্বয় ছাড়া সেই এনযাইম গঠণ সম্ভব নয়। যেহেতু এই দুইটি একে উপরের উপর নির্ভরশীল , তাই এই দুইটির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একই সময়ে দুটিরই উপস্থিতি প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছে এই মতবাদের পক্ষে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক লেসলি অরগেল ১৯৯৪ সালের *Scientific American* ম্যাগাজিনে এটা স্বীকার করেন : এটা একেবারেই অসম্ভব যে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডসমূহ যাদের কাঠামো খুবই জটিল , তারা একই সময়ে একই জায়গায় একইসাথে আপনাআপনি জন্ম নিয়েছে। এছাড়া , এটাও কার্যত: অসম্ভব যে একটি ছাড়া অন্যটির জন্ম হয়েছে। তাই প্রাথমিকভাবে একজনকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে , প্রাণের সৃষ্টি কখনোই রাসায়নিক উপকরণ দিয়ে হয় নি। (Leslie E. Orgel, *"The Origin of Life on Earth", Scientific American*, Vol 271, October 1994, p. 78)

কোনই সন্দেহ নেই যে ,প্রাকৃতিকভাবে যদি প্রাণের বিকাশ অসম্ভব হয়ে থাকে , তবে এটাই মেনে নিতে হবে যে প্রাণের “ সৃষ্টি ” হচ্ছে অতি-প্রাকৃত বা অলৌকিক ব্যপার। এই বাস্তবতা সেই বিবর্তনবাদের যাকে স্পষ্টভাবে অকার্যকর প্রমাণ করে , যার প্রধান লক্ষ্য হলো স্রষ্টার সৃষ্টিকে অস্বীকার করা।

বিবতর্নবাদের কাল্পনিক বিশেষ কলাকৌশল :

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় যা ডারউইনের মতকে মিথ্যা প্রমাণ করে তাহলো , যে দুইটি তত্ত্ব বলা হয়েছিল বিবর্তনবাদের কলাকৌশল হিসাবে , তা বাস্তবে কোন বিবর্তনের শক্তি রাখে না।

ডারউইন তার বিবর্তনবাদীদের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন “ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ” কৌশলের উপর। এই কৌশলের উপর তিনি যে বিশেষ গুরুত্ব দেন তার প্রমাণ বইয়ের নামকরণে পাওয়া যায়-
The Origin of Species, By Means Of Natural Selection…

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল কথা হলো প্রকৃতিতে জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে যারা বেশী শক্তিশালী ও বেঁচে থাকার জন্য বেশী উপযোগী , তারাই প্রকৃতিতে খাপ খাইয়ে জীবন সংগ্রামে টিঁকে থাকে। যেমন: হরিণের দল সবসময়ই হিংস্র পশুদের আক্রমণের হুমকির মুখে থাকে। এদের মধ্যে যে বেশী জোরে দৌড়াতে পারবে, সে বাঁচবে। তার ফলে হরিণের দলে শেষ পর্যন্ত থাকবে কেবল

দ্রুততম ও শক্তিশালী হরিণ। যদিও প্রশ্নাতীতভাবে এই কৌশল হরিণকে বিবর্তনবাদের মাধ্যমে অন্য কোন প্রাণী যেমন ঘোড়াতে পরিণত করবে না। তাই , প্রাকৃতিক নির্বাচনের কৌশলের আসলে কোন প্রাণীকে রুপান্তরের ক্ষমতা নেই। ডারউইন নিজেও এই সত্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তার বই *The Origin of Species* এ এটা স্বীকার করেছেন :
Natural selection can do nothing until favourable variations chance to occur
" প্রকৃতিতে অনুকূল কোন পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচন নিজে কিছু করতে পারে না-- (Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*, Harvard University Press, 1964, p. 189)

লামার্কের প্রভাব:

তো কিভাবে এই "পছন্দের পরিবর্তনগুলি " ঘটে ? ডারউইন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন তার সময়ের বিজ্ঞান সম্পর্কে আদি ধারণাসমূহ থেকে। ফ্রেঞ্চ জীববিজ্ঞানী লামার্ক যিনি ডারউইনের পূর্বসূরী , তার মতে: বেঁচে থাকার সময় প্রাণী যে সব নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে , তা বংশধরদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এর ফলে নতুন এক প্রজাতির সৃষ্টি হয়। যেমন , লামার্কের মতে , জিরাফ এসেছে এন্টিলোপ থেকে। এই জাতীয় হরিণ বেঁচে থাকার জন্য উঁচু গাছের পাতা খাওয়ার চেষ্টা করতো ; ফলে তাদের গলা বংশ পরম্পরায় ধীরে ধীরে লম্বা হতে থাকে।

ডারউইনও অনেকটা একই ধরনের উদাহরণ দেন। The Origin of Species বইতে তিনি উদাহরণ দেন যে , কিছু ভালুক পানিতে খাবার সন্ধান করতে যেত। এভাবে ধীরে ধীরে পরবর্তী সময়ে তারা তিমি মাছে রুপান্তরিত হয়। (Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*, Harvard University Press, 1964, p. 184.)

জন্মগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে মেন্ডেল এর আবিষ্কার ও বিংশ শতাব্দীতে জেনেটিক বিজ্ঞানের সমর্থন এই কাল্পনিক কাহিনীকে পুরোপুরি বাতিল করে দেয় যে , প্রাণীর অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তীতেও সব বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হতেই থাকবে। এভাবে , প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতি বিবর্তনবাদের কৌশল হিসাবে আর জনপ্রিয় থাকলো না।

নব্য-ডারউইনবাদ ও মিউটেশন (রুপান্তর/পরিবর্তন):

১৯৩০ সালের শেষে ডারউইন সমাধান পেতে (Modern Synthetic Theory) বা " আধুনিক সমন্বিত তত্ত্বের" কথা বলেন ; যা নব্য-ডারউইনবাদ হিসাবে বহুল প্রচলিত। এরা প্রাণীর রুপান্তর বা পরিবর্তনের কথা বলেন। মিউটেশন হলো প্রাণীর জীনের ভিন্ন রুপান্তর । বাহ্যিক বিভিন্ন কারণ যেমন তাপ বিকীরণ , প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রাণীর জীনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। " অনুকূল পরিবর্তনের কারণ '' হিসাবে এই মিউটেশন ঘটে। বর্তমানে পৃথিবীতে বিবর্তনবাদের মডেল হলো নব্য-ডারউইনবাদ। এই মত দাবী করে আমরা এখন যে সব প্রাণী দেখি , তা রুপান্তরিত প্রাণী অর্থাৎ মিউটেশনের ফল । জীবন্ত প্রাণীর জটিল শারীরিক কাঠামোগুলি যেমন কান , চোখ , লাংস , ডানা ইত্যাদিতে বহু দিন ধরে ' রুপান্তর '

ঘটেছে ; যা এক ধরনের জেনেটিক বিশৃঙ্খলা । বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এই মতকে সম্পূর্ণ বর্জন করে। মিউটেশন প্রাণীকে উন্নততর পর্যায় নিয়ে যায় না। বরং মিউটেশন প্রাণীকুলের জন্য ক্ষতিকর । এর কারণ খুবই সহজ। ডি এন এর কাঠামো খুবই জটিল ; এই কাঠামোতে এলোমেলো অদল-বদল ক্ষতিরই কারণ হবে। মার্কিন জীনতত্ত্ববিদ B.G. Ranganathan ব্যাখ্যা করে বলেন , মিউটেশন হলো ছোট , আকস্মিক এবং ক্ষতিকর। এটা খুব কমই ঘটে থাকে এবং এটারই সম্ভাবনা বেশী যে , এর তেমন স্থায়ী প্রতিক্রিয়া হবে না। মিউটেশনের চারটি বৈশিষ্ট্যই এই দিক-নির্দেশই দেয় যে , মিউটেশনের মাধ্যমে বিবর্তনে কোন উন্নয়ন ঘটতে পারে না।

বিশেষভাবে গঠিত উচচ ক্ষমতার জৈব-কাঠামোতে উল্টাপাল্টা অদল-বদল হলে তা হয় প্রতিক্রিয়াহীন হবে অথবা হবে ক্ষতিকর। ঘড়ির কাঠামোতে এলামেলো বদল ঘটালে তাতে ঘড়ির কোন উন্নতি হবে না। সম্ভাবনা বেশী যে এটা ক্ষতি করবে অথবা বড়জোর কোন প্রভাব ফেলবে না। ভূমিকম্প হলে একটা শহরের কোন উন্নতি হয় না , বরং তা ধ্বংস ডেকে আনে। (B. G. Ranganathan, *Origins ?*, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.

অবাক হওয়ার কিছু নেই যে , এমন কোন প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি যে মিউটেশনের ফলে কোন প্রাণীর জেনেটিক কোডের উন্নতি ঘটেছে । সব মিউটেশনই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। এটা বুঝতে পারা গিয়েছে , যাকে ‘ বিবর্তনবাদের কলা-কৌশল ’ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে , তা আসলে জেনেটিক কোডে সাধিত হয় এবং প্রাণীর ক্ষতি করে ও তাকে পঙ্গু করে ফেলে (মানুষের উপর মিউটেশনের সাধারণ প্রভাব হলো ক্যান্সার)।

নি:সন্দেহে , কোন ক্ষতিকর পদ্ধতিকে ‘‘ বিবর্তনের কৌশল ’’ বলা যাবে না। অন্যদিকে প্রাকৃতিক নির্বাচন যে ‘‘ নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না ’’---এটা ডারউইন নিজেও স্বীকার করেছেন। এসব তথ্য আমাদেরকে এটাই দেখায় যে , প্রকৃতিতে কোন বিবর্তনবাদের পদ্ধতি নেই । যেহেতু কোন বিবর্তনবাদী কৌশলের অস্তিত্ব নেই , তাই ক্রমবিকাশের কোন কাল্পনিক প্রক্রিয়াও আসলে ঘটে নি।

ফসিল / জীবাশ্মের ইতিহাস: মধ্যবর্তী আকৃতির কোন চিহ্ন নেই :

জীবাশ্মের ইতিহাস সবচেয়ে সুস্পষ্ট বাস্তবতা যে , বিবর্তনবাদ আসলে সংঘটিত হয় নি। বিবর্তনবাদের মত অনুযায়ী , সব জীবন্ত প্রাণীই তার পূর্ব-পুরুষ থেকে এসেছে। অতীতের প্রজাতিরা সময়ের সাথে সাথে ভিন্ন প্রজাতিতে রুপান্তরিত হয়। সব প্রজাতিই এভাবে এসেছে। এই মত অনুযায়ী , লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই রুপান্তর প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে।

যদি তাই হতো , তাহলে অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতো এবং এই দীর্ঘ রুপান্তরের সময়ে অবশ্যই অসংখ্য প্রজাতি বেঁচে থাকতো। যেমন , অর্ধেক মাছ / অর্ধেক সরীসৃপের অতীতে বেঁচে থাকার কথা , যারা মাছের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি সরীসৃপের বৈশিষ্ট্যও অর্জন করেছিল ; অথবা সরীসৃপ-পাখীর অস্তিত্ব থাকতো যারা সরীসৃপের পাশাপাশি

পাখির বৈশিষ্ট্যও অর্জন করেছিল। এই পরিবর্তিত অবস্থা চলার সময় তাদের ত্রুটিপূর্ণ ও পঙ্গু প্রাণীতে পরিণত হওয়ার কথা।

বিবর্তনবাদীরা এসব কাল্পনিক প্রাণীর অস্তিত্ব অতীতে ছিল বলে বিশ্বাস করে ও এদেরকে নাম দিয়েছে ‘‘ পরিবর্তনকালীন প্রতিমূর্তি ’ ("transitional forms."
এসব প্রাণী যদি সত্যিই থাকতো , তাহলে অবশ্যই লক্ষ , লক্ষ এমন কী কোটি , কোটি সংখ্যার নানা বৈচিত্রের প্রাণী থাকতো । সবচেয়ে বড় কথা , ফসিলের ইতিহাসের এসব আজব প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ অবশ্যই থাকতো। ডারউইন *The Origin of Species* ব্যাখ্যা করে বলেন : যদি আমার তত্ত্ব সঠিক হয়, তবে অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতি যারা যে প্রজাতি থেকে এসেছে তাদের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল------পরিণামে তাদের পূর্ববর্তী অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে কেবলমাত্র ফসিলের মধ্যে। (Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*, Harvard University Press, 1964, p. 179)

ডারউইনের আশা চূর্ণ:

ফসিলের সন্ধানে যদিও ১৯ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুরো পৃথিবী জুড়ে বিবর্তনবাদীরা কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় , মধ্যবর্তী প্রজাতির কোন অস্তিত্ব তারা আবিষ্কার করতে পারে নি। সব ফসিল বিবর্তনবাদীদের প্রত্যাশার বিপরীত প্রমাণ পেশ করে যে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব হঠাৎ করে হয়েছে এবং তা হয়েছে পূর্ণ আকৃতিতেই। বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডেরেক ভিএযার এই মত স্বীকার করে নেন --যদিও তিনি ছিলেন একজন বিবর্তনবাদী।

আমরা যদি জীবাশ্মের ইতিহাস পরীক্ষা করি , তা সে সময়ের ক্রম হিসাবেই হোক বা বিশেষ প্রজাতিকে নিয়েই হোক্ , তা বারেবারে এটাই নির্দেশ করে যে , সব জীবন্ত প্রাণী ধাপে ধাপে বিবর্তনের মাধ্যমে নয় বরং হঠাৎ করেই এসেছে। (Derek A. Ager, *"The Nature of the Fossil Record"*, Proceedings of the British Geological Association, vol 87, 1976, p. 133)

অর্থাৎ জীবাশ্মের ইতিহাসে সব জীবন্ত প্রাণীর আকস্মিক আবির্ভাব হলো পূর্ণ অবয়বে ---- মধ্যবর্তী কোন আকৃতি ছাড়াই। এ হলো , ডারউইনের অনুমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। এছাড়াও , এটা খুবই শক্তিশালী প্রমাণ যে ,জীবন্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন পূর্ব-পুরুষ থেকে বিবর্তন ছাড়াই জীবন্ত প্রাণীর পূর্ণ অবয়বে অপ্রত্যাশিত সৃষ্টির একটাই ব্যাখ্যা হলো , এসব প্রজাতিকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। বিখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী ডগলাম ফুতুয়িমাও এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

সৃষ্টি ও বিবর্তনবাদ --এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে প্রাণের বিকাশের সম্ভাব্যতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে আলোচনা। জৈবিক কাঠামো পৃথিবীতে পূর্ণ অবয়বে এসেছে অথবা আসে নি। যদি না এসে থাকে , তাহলে অবশ্যই আগের কোন প্রজাতির থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উন্নয়নের মাধ্যমে তারা বিকশিত হয়েছে । আর যদি পূর্ণ আকৃতিতে তারা এসে থাকে , তবে তারা অবশ্যই সৃষ্ট হয়েছে কোন সর্বশক্তিমান , সর্বজ্ঞানীর দ্বারা। (Douglas J. Futuyma, *Science on Trial*, New York: Pantheon Books, 1983. p. 197)

জীবাশ্ম নির্দেশ করে , পৃথিবীতে প্রাণী এসেছে পূর্ণ আকৃতিতে এবং নিখুঁত অবস্থায়। অর্থাৎ প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে ডারউইনের ধারণার বিপরীতে সৃষ্টির মাধ্যমে , বিবর্তনের মাধ্যমে নয়।

মানব বিবর্তনের কাহিনী:

বিবর্তনের প্রচারকারীরা প্রায়ই একটি বিষয় আলোচনায় আনেন , তাহলো মানুষের উৎপত্তি। ডারউইনবাদীরা দাবী করে , বর্তমানের মানুষ এসেছে এক ধরনের বানর জাতীয় প্রাণী থেকে। তাদের মতে , ৪-৫ মিলিয়ন বৎসর আগে বিবর্তনবাদের প্রক্রিয়ায় এখনকার মানুষ ও তার পূর্ব-পুরুষদের মধ্যবর্তী ‘‘ রুপান্তরিত প্রজাতির’’ অস্তিত্ব ছিল। এই কাল্পনিক চিত্রে চারটি প্রধান শ্রেণী রয়েছে।

১। অস্ট্রেলোপিথিকোস Australopithecus

২। হোমো হেবেলিস Homo habilis

৩। হোমো ইরেক্টাস Homo erectus

৪। হোমো সেপিয়েনস Homo sapiens

মানুষের প্রথম তথাকথিত বানর-জাতীয় পূর্বপুরুষদেরকে বিবর্তনবাদীরা নাম দিয়েছে ‘অস্ট্রেলোপিথিকোস ’ যার অর্থ দক্ষিণ আফ্রিকার বানর বা বন-মানুষ। এই জীবন্ত প্রাণীরা আসলে কিছুই নয় বরং প্রাচীন বানরের প্রজাতি যারা পরে ধ্বংস হয়ে যায়। এই প্রজাতির উপর ব্যাপক গবেষণা করেন বিশ্বের দুই বিখ্যাত এনাটমিস্ট (শরীরতত্ত্ববিদ) ইংল্যান্ড ও আমেরিকার লর্ড সলি যুকারমেন ও অধ্যাপক চার্লস অক্সফোর্ড। এরা দেখান যে , এই প্রজাতি সাধারণ বানরের প্রজাতির এবং পরে ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের সাথে কোনভাবেই এদের কোন মিল নেই। (Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower*, New York: Toplinger Publications, 1970, pp. 75-94; Charles E. Oxnard, *"The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt"*, Nature, Vol 258, p. 389)

বিবর্তনবাদীরা শ্রেণীভাগ অনুযায়ী মানব বিবর্তনের পরবতী ধাপ হলো হোমো -- যা হলো মানুষ। বিবর্তনবাদীদের দাবী অনুসারে ‘অস্ট্রেলোপিথিকোসদের তুলনায় হোমো প্রজাতির প্রাণীরা বেশী উন্নত।

প্রাণীর বিভিন্ন জীবাশ্ম এক নির্দিষ্ট ধারায় সাজিয়ে বিবর্তনবাদীরা খেয়াল খুশী মতো বিবর্তনের এক কাল্পনিক নকশা আবিষ্কার করেছেন। এই নকশা কাল্পনিক কেননা , এটা কখনোই প্রমাণিত হয় নি যে , এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন ক্রমবিকাশের সম্পর্ক ছিল। আর্নেষ্ট

মেয়র , বিংশ শতাব্দীতে বিবর্তনবাদের অন্যতম প্রধান সমর্থক এটা স্বীকার করেন। তিনি বলেন : হোমো সেপিয়েনস পর্যন্ত আসতে আসতে সংযোগ সূত্র আসলে হারিয়ে যায়। (J. Rennie, *"Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr"*, *Scientific American*, December 1992)

সংযোগ সূত্রকে Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens-- এভাবে চিত্রিত করে বিবর্তনবাদীরা বলতে চায় , এসব প্রজাতি একে অন্যের পূর্বপুরুষ ; যদিও সাম্প্রতিক সময়ের নৃতাত্ত্বিক জীবাশ্মের আবিষ্কার প্রমাণ করে যে অস্ট্রেলোপিথিকোস,
হামো হেবেলিস ও হোমো ইরেক্টাস আসলে একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাস করতো। (Alan Walker, Science, vol. 207, 1980, p. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1st ed., New York: J. B. Lipincott Co., 1970, p. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, p. 272)

এছাড়াও , যাদেরকে হোমো ইরেক্টাস বলা হচ্ছে , তাদের এক অংশ এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত বেঁচে ছিল। হোমো সেপিয়েন্স নিনডারথালেনসিস ও হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন (আধুনিক মানুষ) একই সময়ে একই অঞ্চলে বাস করেছে (Time, November 1996) ।

এই পরিস্থিতি এ দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করে যে , এরা একে অন্যের পূর্বপুরুষ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাশ্ম বিজ্ঞানী স্টিফেন জে গোল্ড বিবর্তন তত্ত্বের এই কোণ-ঠাসা অবস্থার ব্যাখ্যা করেন -- যদিও তিনি নিজেও একজন বিবর্তনবাদী। " আমাদের উত্তরণের কী হবে যদি তিনটি জাতি *(A. africanus, the robust australopithecines, and H. habilis), একই সাথে বাস করে এবং স্পষ্টত:ই একে অন্যের থেকে আসে নি ? সবচেয়ে বড় কথা , এই পৃথিবীতে বাস করার সময় কেউই বিবর্তনের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে নি। (*. S. J. Gould, *Natural History*, vol. 85, 1976, p. 30)

" অর্ধেক বানর , অর্ধেক মানুষ '' --এসব বিভিন্ন আঁকা ছবির সাহায্যে মানব বিবর্তনের যে চিত্র গণমাধ্যম ও পাঠ্য বইতে তুলে ধরা হয়েছিল , স্পষ্ট ভাষায় বললে তা এক প্রতারণা। এটা আর কিছুই নয় বরং এক উপকথা যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। লর্ড সলি যুকারম্যান , ব্রিটেনের অন্যতম বিখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী ; এই বিষয়ে তিনি বহু বছর গবেষণা করেন। বিশেষত: Australopithecus জীবাশ্মের উপর ১৫ বছর পড়াশোনা করেন। তিনি নিজে বিবর্তনবাদী হয়েও শেষ পর্যন্ত এটা স্বীকার করেন যে , বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত কোন বংশ-তালিকা আসলে নেই।

যুকারম্যান বিজ্ঞানের একটি বর্ণালী শ্রেণীবিন্যাস করেন। যে সব বিষয়কে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক ও অবৈজ্ঞানিক মনে করেন , তার একটি তালিকা তিনি করেন। তার মতে , বিজ্ঞানের সুদৃঢ় তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক ক্ষেত্রে হলো রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা। এরপর আসে জীববিজ্ঞান , তারপর সামাজিক বিজ্ঞান । তালিকার শেষের দিকে রয়েছে সবচেয়ে বড় অবৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি। এর মধ্যে আছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি যেমন টেলিপ্যাথী এবং ষষ্ঠ

ইন্দ্রিয়। সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিকের তালিকার সব শেষে এসেছে মানব বিবর্তন। যুকারম্যান এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন , " তালিকাভুক্তি করার সময় বস্তুনিষ্ঠ সত্যের ক্ষেত্র থেকে অনুমিত জীববিজ্ঞানকে আলাদা করেছি ; যেমন: অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বা মানুষের জীবাশ্মের ইতিহাসের ব্যাখ্যা। যারা সৎ বিবর্তনবাদী তারা সব সম্ভাবনাকে সত্য বলে যাচাই করবে ; কিন্তু যারা বিবর্তনবাদে অতি উৎসাহী তারা কখনো কখনো বিরোধপূর্ণ বিষয়কেও একই সাথে বিশ্বাস করে (Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower*, New York: Toplinger Publications, 1970, p. 19)

মানব বিবর্তনের কাহিনী আর কিছুই নয় বরং জীবাশ্মের ব্যপারে কিছু মানুষের পূর্ব-ধারণা প্রসুত ব্যাখ্যা যা তারা অন্ধবিশ্বাসে আঁকড়ে আছে।

চোখ ও কানের প্রযুক্তি:

বিবর্তন তত্ত্বে আরেকটি বিষয় অমীমাংসিত ,তাহলো চোখ ও কানের দারুণ উপলব্ধির ক্ষমতা। চোখ নিয়ে আলোচনার আগে সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাক্----আমরা কিভাবে দেখি ? কোন বস্তু থেকে আলোর রশ্মি উল্টো প্রতিবিম্ব চোখের রেটিনাতে এসে পড়ে। এই রশ্মি সেলের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠায় এবং ব্রেনের পিছনে ছোট্ট এক বিন্দু যাকে দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় , সেখানে পৌঁছে। এই বৈদ্যুতিক সংকেত ব্রেনের কেন্দ্রবিন্দুতে বেশ কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সোজা প্রতিবিম্ব হিসাবে উপস্থাপিত হয়। এমন কারিগরী কলা-কৌশলকে পটভূমিতে রেখে চলুন আমরা কিছু চিন্তা করি।

আলো থেকে আমাদের ব্রেন সম্পূর্ণ আলাদা অর্থাৎ ব্রেনের ভিতরে সম্পূর্ণ অন্ধকার । ব্রেনের যেখানে অবস্থান সেখানে আলো পৌঁছাতে পারে না । যাকে বলা হয় 'দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু ' সেই জায়গাটি পুরোপুরি একটি অন্ধকারময় স্থান যেখানে কখনোই কোন আলো যেতে পারেনি। আপনার চেনা-জানার জগতে সম্ভবত এটাই সবচেয়ে অন্ধকারময় জায়গা। যদিও আপনি এই সম্পূর্ণ অন্ধকার জগত থেকেই আলোকময় পৃথিবীকে দেখতে পান। চোখের ভিতরে যে ছবি তৈরী হয় , তা এতো তীক্ষ্ণ ও অভ্রান্ত যে , এমন কী এই বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিও তা অর্জনে ব্যর্থ। যেমন , যে বইটি আপনি পড়ছেন তার দিকে তাকান , আপনার হাতের দিকে তাকান ; তারপর মাথা তুলে চারপাশে দেখুন । কখনো কি এমন ,তীক্ষ্ণ , স্পষ্ট , নির্ভুল প্রতিবিম্ব কোথাও দেখেছেন ? বিশ্বের সবচেয়ে বড় টিভি নির্মাতাও তার সবচেয়ে আধুনিক টিভি পর্দায় এরকম তীক্ষ্ণ প্রতিবিম্ব আপনাকে দেখাতে পারবে না। চোখ দিয়ে যা দেখি , তা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক , রঙীন এবং অত্যাধিক তীক্ষ্ণ প্রতিবিম্ব। ১০০ বছরের বেশী সময় ধরে হাজার হাজার প্রকৌশলী এই তীক্ষ্ণতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করছেন। কারখানা , বিশাল ভবন তৈরী হয়েছে ; প্রচুর গবেষণা হয়েছে , নক্শা ও পরিকল্পনা করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে। আবারো টিভি পর্দার দিকে তাকান আর আপনার হাতে ধরা বইয়ের দিকে তাকান। আপনি দেখবেন এই দুইয়ের তীক্ষ্ণতা ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে । এছাড়া , টিভি আপনাকে দেখাচ্ছে দ্বি-মাত্রিক চিত্র যেখানে আপনি চোখের সাহায্যে ত্রি-মাত্রিক প্রতিচ্ছবি গভীরভাবে অনুভব করতে পারছেন।

বহু বছর ধরে হাজারো প্রকৌশলী চেষ্টা করছে ত্রি-মাত্রিক টিভি বানাতে ও চোখের দৃষ্টির সমমানে আসতে । হ্যাঁ , তারা ত্রি-মাত্রিক টিভির এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে কিন্তু বিশেষ চশমা

না পরলে সে টিভি দেখা যায় না। এছাড়াও , এটা কেবলমাত্র একটি কৃত্রিম ত্রি-মাত্রিক ব্যবস্থা। এর পটভূমি থাকে ঝাপসা , সামনের দিক মনে হয় ঝুলানো কাগজের কাঠামো। চোখের মাধ্যমে যে তীক্ষ্ণ ও বিশেষমানের ছবি আমরা দেখি , সেই মানের প্রতিবিম্ব তৈরী করা আজো সম্ভব হয় নি। ক্যামেরা ও টিভি--এই দুই মাধ্যমেই প্রতিবিম্বের মানের ক্ষতি হয়।

বিবর্তনবাদীরা দাবী করে , যে কারিগরীর মাধ্যমে আমরা বিশেষ মানের তীক্ষ্ণ প্রতিচ্ছবি দেখি , তা ঘটনাচক্রে ঘটেছে। এখন যদি কেউ আপনাকে বলে , আপনার কামরার টিভি সেটটি হঠাৎ করেই তৈরী হয়ে গিয়েছে , তাহলে আপনি কী ভাববেন ? অনেক পরমাণু হঠাৎ করে একসাথে হয়ে এমন এক দৃষ্টি কৌশল আবিষ্কার করলো যার মাধ্যমে অত্যন্ত উন্নত মানের প্রতিচ্ছবি তৈরী হয় । পরমাণু কেমন করে এটা করে ফেললো যা হাজারো মানুষ করতে পারছে না ? যদি চোখের তুলনায় অনুন্নত প্রতিচ্ছবি দেখাচ্ছে এমন একটি যন্ত্র আপনাআপনি সৃষ্ট না হয় , তাহলে তা এটাই প্রমাণ করে যে , চোখ ও চোখের সাহায্যে দেখা প্রতিচ্ছবি ঘটনাচক্রে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়।

এই একই অবস্থা কানের জন্যও প্রযোজ্য। কানের বাইরের অংশ শব্দ পৌঁছে দেয় কানের মধ্যভাগে। কানের এই অংশ শব্দের প্রতিধ্বনি তীব্রতর করে পরিবাহিত করে। কানের ভিতরের অংশ এই প্রতিধ্বনিকে বৈদ্যুতিক সংকেত হিসাবে মস্তিস্কে পাঠায়। ঠিক দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুর মতোই ব্রেন বা মস্তিস্কের শ্রবণের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে শব্দ শোনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। চোখের পরিস্থিতি কানের জন্যও সত্য। তাহলো , ব্রেন আলোর মতো শব্দের থেকেও আলাদা অবস্থানে থাকে। মানুষের ব্রেন শব্দকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। তাই এতে কিছু যায় আসে না যে বাইরে কী প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছে। ব্রেনের ভিতরের অংশ থাকে সম্পূর্ণ নি:স্তব্ধ । তবুও ,তীক্ষ্ণতম শব্দটিকে ব্রেন উপলব্ধি করে। শব্দ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আপনার এই ব্রেনের ভিতরেই আপনি শুনেন বাজনাদারদের যন্ত্রের ধ্বনি । এছাড়া , কোন ভীড়ের মধ্যেকার সব আওয়াজও আপনি শুনেন। যদি কোন যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সময়ে আপনার ব্রেনের ভিতরে মাপা যায় , তাহলে দেখা যাবে ব্রেনের ভিতরের জায়গা পুরোপুরি শব্দহীন।

বহু দশক ধরে চেষ্টা চলেছে প্রকৃত শব্দের অনুরূপ প্রতিধ্বনি তৈরী ও পুনরায় উৎপাদন। এসব চেষ্টার ফল হলো শব্দ রেকর্ড করার যন্ত্র , উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পদ্ধতি এবং শব্দ অনুভব করার ব্যবস্থাদি। এসব প্রযুক্তি থাকার পরেও এবং হাজারো প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞ এই ক্ষেত্রে কাজ করার পরেও এমন কোন শব্দ ধারণ করা যায় নি যা কানের শব্দ উপলব্ধি ক্ষমতার মত তীব্র ও স্পষ্ট। সংগীত শিল্পের সবচেয়ে বড় কোম্পানীর সর্বাধিক উন্নত মানের হাই-ফাই সিস্টেমের কথা চিন্তা করুন। এসব যন্ত্রে শব্দ ধারণ করা হলে তার অনেকটাই হারিয়ে যায় ; অথবা আপনি যখন হাই-ফাই যন্ত্রটি চালু করেন ,তখন সবসময়ই গান শুরুর আগে একটি হিসহিস ধ্বনি শুনতে পান। মানব দেহের কারিগরীতে যে শব্দ আপনি শুনেন , তা সাংঘাতিক তীব্র ও স্পষ্ট। মানুষের কান কখনো একটি শব্দের সাথে হিসহিস আওয়াজ শুনবে না যা মেশিনে শোনা যায়। শব্দ যেমন থাকে কান ঠিক তেমনটি শুনে ---তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই এমনটি হয়ে আসছে।

মানুষের চোখ ও কান সূক্ষ্ম অনুভূতিসহ যতটা সার্থকভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য উপলব্ধি করে--- এখনো পর্যন্ত মানুষের তৈরী কোন অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং যন্ত্র তেমনটি পারে নি। দৃষ্টি ও শ্রবণের ক্ষেত্রে একটি বড় সত্য লুকিয়ে আছে। দেখা ও শোনার ব্যাপারে ব্রেনের এই যে চেতনা , তা কার আজ্ঞাধীন ?

তিনি কে , যিনি ব্রেনের ভিতরে মনোহর এক পৃথিবীকে দেখাচ্ছেন ? সংগীতের সুর আর পাখির কিচির-মিচির শোনাচ্ছেন আর গোলাপের গন্ধ শোঁকাচ্ছেন ? মানুষের চোখ , কান ও নাক থেকে যে উদ্দীপনা আসে , তা ব্রেনে পোঁছায় বৈদ্যুতিক - রাসায়নিক স্নায়বিক তাড়না হিসাবে।কিভাবে অবিকল প্রতিরূপ ব্রেনে গঠিত হয় ,সে সম্পর্কে জীববিজ্ঞান , শারীরবিদ্যা ও জৈব-রাসায়নিক বইতে আপনি বিস্তারিত তথ্য পাবেন। যদিও এই বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনি এসব বইতে পাবেন না। কে তিনি , যিনি এসব বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক স্নায়বিক তাড়নাকে প্রতিচ্ছবি , শব্দ , গন্ধ ও অনুভূতি হিসাবে ব্রেনকে উপলব্ধি করাচ্ছেন ?

ব্রেন তার ভিতরে চোখ , কান , নাক থাকার কোন দরকার বোধ করছে না। এসব ছাড়াই সে তার চেতনা দিয়ে এসব উপলব্ধি করছে। এই যে জ্ঞান বা ক্ষমতা -- তার দাবীদার কে ? নি:সন্দেহে এ ক্ষমতা ব্রেন যা দিয়ে গঠিত সেই স্নায়ু , পুরু স্তর বা নিউরণের অধীন নয় । এই কারণে ডারউইনবাদী-বস্তুবাদীরা যারা বিশ্বাস করে জড় থেকে প্রাণ এসেছে , তারা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এই চেতনার জন্য আল্লাহ আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন। দেখার জন্য আত্মার চোখের দরকার নেই , শোনার জন্য কানের দরকার নেই । এছাড়াও , চিন্তার জন্য তার ব্রেনেরও দরকার নেই। যারা এতক্ষণ এই বিশদ আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে পড়লেন , তাদের উচিত আল্লাহকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা , তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর কাছেই আশ্রয় চাওয়া। তিনিই আল্লাহ যিনি এক সম্পূর্ণ অন্ধকার , মাত্র কয়েক ঘন সেন্টিমিটারের মধ্যে পুরো মহাবিশ্বকে ঠেসে ভরে দিয়েছেন ত্রি-মাকি , রঙীন , ছায়াময় ও উজ্জ্বল আকৃতিতে।

বস্তুবাদী বিশ্বাস:

এ পর্যন্ত আমরা যে সব তথ্য উপস্থাপন করলাম , তা এটাই দেখায় যে , বিবর্তনবাদের তত্ত্ব হিসাবে যা দাবী করা হয়েছিল , তা বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির বিপরীত। প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে এই তত্ত্বের দাবী বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিবর্তনবাদীদের যে কলা-কৌশলের কথা তারা বলে , তার আসলে বিবর্তন ঘটানোর কোন শক্তি নেই। জীবাশ্ম এটাই দেখায় যে , এই মতের দাবী অনুসারে যে মধ্যবর্তী প্রাণীর থাকার কথা ছিল , তার অস্তিত্ব আসলে কখনোই ছিল না । তাই , অবৈজ্ঞানিক হিসাবে বিবর্তনবাদের তত্ত্বকে অবশ্যই এক পাশে সরিয়ে ফেলতে হবে।অতীতে যেভাবে বিজ্ঞানের বিষয় থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে অনেক ধারণাকে ; যেমন: পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি। যাহোক , বিবর্তনবাদের মত এখনো বিজ্ঞানের একটি জরুরী বিষয় হিসাবে বিবেচ্য। কিছু মানুষ এই মতের সমালোচনাকে বিজ্ঞানের উপর আক্রমণ হিসাবে তুলে ধরেন ...কেন ?

এর কারণ হলো , কিছু মহলের কাছে এই বিবর্তনবাদ মত অপরিহার্য। এই চক্রের সদস্যরা বস্তুবাদী আদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং বিবর্তনবাদকে গ্রহণ করে ; কেননা , বস্তুবাদের পক্ষে এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা যা তাদের কাজের ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলে।

মজার ব্যাপার হলো , তারা নিজেরাও এটা নানা সময়ে স্বীকার করেছে। সুপরিচিত জেনেটিকবিদ ও বিবর্তনবাদের স্পষ্ট বক্তা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড সি লিওয়ানটিন স্বীকার করেন , তিনি আগে একজন বস্তুবাদী , পরে বিজ্ঞানী। এমন নয় যে , এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব সম্পর্কে একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণে বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক কোন প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে বাধ্য করে। বরং বস্তু বা ভোগবাদীতার প্রতি অনুরাগই আমাদেরকে বাধ্য করে উদ্দেশ্যমূলক অনুসন্ধান চালাতে ও নির্দিষ্ট মত সৃষ্টি করতে , যা বস্তুবাদিতার সমর্থক। এতে কিছু যায় আসে না যে , আমাদের স্বত:স্ফূর্ত জ্ঞান বা সাধারণ অনুভূতি এর বিরুদ্ধে । এছাড়া , কতটা রহস্যজনকভাবে এই মতের সৃষ্টি হলো। রিচার্ড লিওটনের মন্তব্য হলো , বস্তুবাদিতা হলো স্বেচ্ছাচারিতা ---এর মধ্যে

ঐশ্বরিক বিষয় আমরা আনতে পারি না। (Richard Lewontin, *"The Demon-Haunted World"*, The New York Review of Books, 9 January, 1997, p. 28)

এটা হলো স্পষ্ট বিবৃতি যে বিবর্তনবাদ হলো এমন এক মত , যাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র ভোগবাদী মতবাদের প্রতি অনুরাগের কারণে। এই মত বর্ণনা করে যে , জড় পদার্থ ছাড়া আর কোনকিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তাই এরা দাবী করে ---প্রাণহীন ,অচেতন পদার্থ থেকে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। এরা জোর দিয়ে বলে যে লক্ষ , লক্ষ বিভিন্ন প্রকারের জীবন্ত প্রজাতি যেমন: পাখি , মাছ , জিরাফ ,বাঘ , কীট-পতঙ্গ , গাছ , ফুল , তিমি এবং মানুষের উৎপত্তি হয়েছে কিছু জড় পদার্থের মধ্যে আন্ত:ক্রিয়ার কারণে। যেমন , বৃষ্টি , বিদ্যুৎ ইত্যাদি। এই ধারণা যুক্তি ও বিজ্ঞান --দুটোরই বিরোধী। তবুও বিবর্তনবাদীরা এই মতকে সমর্থন করে যাচ্ছেন শুধুমাত্র যেন ''কোন ঐশ্বরিক কিছু এর মধ্যে না আসতে পারে। ”

যারা ভোগের প্রেক্ষাপটে জীবনের উৎপত্তিকে দেখবে না ,তারাই স্পষ্ট সত্যকে দেখতে পারবে : সব জীবন্ত প্রাণীই হলো স্রষ্টার সৃষ্টি যিনি সর্ব-শক্তিমান ,সর্ব জ্ঞানী। তিনি সব দেখেন , সব শুনেন , সব জানেন । এই স্রষ্টাই হলেন আল্লাহ যিনি
অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে এই পুরো মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন ; একে সাজিয়েছেন সর্বোত্তম সুন্দর আকারে এবং সব জীবন্ত প্রাণীকে যিনি আকৃতি দিয়েছেন --“ তারা
(ফিরিশতারা) বললো : আপনি পবিত্র ; আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন , তাছাড়া আমাদের কোনই জ্ঞান নেই; নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত জ্ঞানী , বিজ্ঞানময় ''
(পবিত্র কুরআন ; সুরা বাকারা ; ২: ৩২) ।

সমাপ্তি:

পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিমদের কাছে সুপারিশসমূহ:

ইসলামের নামে যেসব দল সন্ত্রাস করে --পশ্চিমা বিশ্ব বর্তমানে তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং এই উদ্বেগ যথার্থ। অবশ্যই যারা সন্ত্রাস করে ও যারা সন্ত্রাসের সমর্থক তাদের আন্তর্জাতিক আইনে বিচার হওয়া উচিত। অবশ্য এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কোন দীর্ঘস্থায়ী উপায় বিবেচনা করা যা এসব সন্ত্রাসী সমস্যার সমাধান বের করতে পারবে। উপরের পর্যালোচনায় এটা প্রমাণিত যে , ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই এবং সন্ত্রাস হলো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

এটা আরো দেখায় যে , ‘ ইসলামিক সন্ত্রাস’ হলো ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী। এটা গুরুত্বপূর্ণ যা থেকে আমরা সুবিধাজনক অবস্থান থেকে কিছু দিক–নির্দেশনা পাই :

১। সতর্কতা , সহানুভূতি ও বুদ্ধি–বিবেচনার সাথে কাজ করার সময় এসেছে। ‘ সভ্যতার সংঘর্ষের ’ ক্ষতিকর চিত্র পুরো বিশ্বের জন্যই আঘাত বয়ে আনছে এবং এ থেকে কারোরই কোন উপকার হয় না। কিভাবে শান্তিতে পাশাপাশি থাকা যায় , তা শেখার সুযোগ বিশ্বের মানুষকে গ্রহণ করতে হবে। একে অন্যের কাছে থেকে শিখবে ; অন্যের ইতিহাস জানবে। ধর্ম , শিল্পকলা , সাহিত্য , দর্শণ , বিজ্ঞান , কারিগরী শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে একে অন্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।

২। ইসলামের প্রকৃত রুপ তুলে ধরে , এমন কার্যক্রম সব জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশগুলিতে চরমপন্থী ইসলামী দলগুলিকে নিয়ে যে সমস্যা , তার সমাধানের একমাত্র উপায় ‘ বাধ্যতামূলক ধর্মনিরপেক্ষতা ’ হওয়া উচিৎ নয়। বরং , এ সব নীতি জনগণের মধ্যে আরো বেশী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। সমাধান হলো এই যে , প্রকৃত ইসলামের প্রচার করতে হবে সব জায়গায় এবং প্রকৃত মুসলিম আদর্শের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে হবে যা কুরআনের বিভিন্ন মূল্যবোধগুলি যেমন মানব অধিকার, গণতন্ত্র , স্বাধীনতা , উচ্চ নৈতিকতা , বিজ্ঞান , আধ্যাত্মিকতা , সৌন্দর্য্য–বিজ্ঞান ও যা মানবতাকে দেয় আনন্দ ও আশীর্বাদ। কুরআনের নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে মুসলমানরা অবশ্যই ব্যাখ্যা করে বোঝাবে এবং কুরআন এবং আল্লাহ’র রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এর নীতির আলোকে তাঁরা বাস করবে।

যারা ইসলামের অপপ্রয়োগ ঘটাচ্ছে (যার জন্য ইসলাম সম্পর্কে ভুল বোঝাবোঝি বাড়ছে) , তাদের হাত থেকে ইসলামকে বের করে আনা মুসলমানদের কর্তব্য। যারা ইসলামিক মূল্যবোধ ও আল্লাহ’র রাসুল হযরত (দঃ) এর আদর্শে জীবন কাটাচ্ছে তাঁদের হাতে ইসলামকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

৩। সন্ত্রাসের উৎস হলো অজ্ঞতা ও ঘৃণা এবং সমাধান হলো শিক্ষায়। যারা সন্ত্রাসের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদেরকে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হবে যে সন্ত্রাস হলো ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরতীধর্মী এবং এটা ব্যাপকভাবে শুধুমাত্র ইসলাম , মুসলমান এবং মানবতার প্রচন্ড ক্ষতিই করছে।

৪। সন্ত্রাসের মোকাবেলায় দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক সমাধানগুলিকে প্রয়োগ করতে হবে , যে সন্ত্রাসের মুল রয়েছে সাম্যবাদ , ফ্যাসীবাদ ও বর্ণবাদ আদর্শগুলিতে। বর্তমানে পুরো পৃথিবীতেই

ডারউইনের মতবাদের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা আগে যে বিষয়ের উপর জোর দিয়েছি । ডারউইনিজম হলো একটি ভুল আদর্শ যা মানুষকে দেখে এমন এক প্রাণী হিসাবে , যার উন্নয়ন ঘটে কেবলমাত্র টিঁকে থাকার জন্য লড়াই করে। এই বিশ্বাস সব ধরনের সন্ত্রাসের ভিত্তি গঠণ করে , যে আদর্শ এটাই ভবিষ্যতবাণী করে যে ------ শুধুমাত্র যারাই ক্ষমতার অধিকারী তারাই টিঁকে থাকবে এবং যে আদর্শ যুদ্ধকে মহান কাজ বলে মনে করে-- সেটা হলো বিশাল এক জলাভূমির মতো যা কখনোই পৃথিবীতে বিপর্যয় থামাতে পারবে না। অবস্থা যখন এমন তখন আইন ও বিচার বিভাগ ছাড়াও আরো কিছু ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন যা সন্ত্রাসকে মোকাবেলা করতে পারবে ; পুরো পৃথিবীতে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে।

ডারউইনিজম ও ভোগবাদিতার মুখোশ তুলে ধরা এবং মানুষের জন্য আল্লাহ যে সব উত্তম মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে সবই হবে শিক্ষার ভিত্তি। প্রকৃত সত্য ধর্মের উৎস আদর্শগুলির ভিত্তিতে বেঁচে থাকার মধ্য দিয়েই কেবল শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। জলাভূমির সংস্কার না করে এই পৃথিবীকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।আমাদের আশা এই যে এই সব পদক্ষেপ পৃথিবীকে সন্ত্রাস ও অন্য সব ঘৃণা সৃষ্টিকারী নিষ্ঠুর , অসভ্য কাঠামো থেকে মুক্ত করবে।

যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে সংজ্ঞায়িত করেছে , ‘‘ স্রষ্টার অধীন একটি জাতি ’’ (a nation under God) হিসাবে । সত্যিকার খৃস্টান সংস্কৃতি ধারক হলে এদের তো মুসলমানদের বন্ধুই হওয়ার কথা। কুরআনে আল্লাহ্ এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং আমাদেরকে জানিয়েছেন যে খৃস্টান হলো তারাই যারা ‘‘ বিশ্বাসীদের সবচেয়ে কাছের (সুরা মায়িদা , ৫ : ৮২)।

অতীতে কিছু অজ্ঞ মানুষ (যেমন খৃস্টান ধর্মযোদ্ধারা) এটা বুঝতে পারে নি এবং দুই ধর্মের মানুষদের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়েছে। এটা ঘটেছিল ‘ সভ্যতার সংঘর্ষ ’ বা পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ ---এই মতাদর্শ থেকে। এই ধরণের ঘটনা যাতে আর কখনো না ঘটে , প্রকৃত ধার্মিক খৃস্টান ও মুসলমানদের তাই পরস্পরের কাছাকাছি আসতে হবে ও একে অন্যকে সাহায্য করবে। অবশ্যই , এ ধরণের শোকাবহ ঘটনাগুলি ঘটার পর যে উন্নয়ন ঘটেছে তা নির্দেশ করে যে সহযোগিতার বীজ এরই মধ্যে লাগানো হয়ে গিয়েছে। সন্ত্রাসের এই দু:খজনক কার্যকলাপ খৃস্টান ও

মুসলমানদেরকে পরস্পরের কাছে এনেছে ; এটা অনেক খৃস্টানকেই ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশী করে জানতে সাহায্য করেছে এবং মুসলমানদের উৎসাহিত করেছে আরো বৃহত্তর প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে যাতে কোরআনে বর্ণিত ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে তারা অন্যদের জানাতে পারে। এসব উন্নয়ন হলো অত্যন্ত সুসংবাদ যে মানুষ এখন ইসলামী মুল্যবোধকে আরো ভালভাবে বুঝতে পারবে ও তাঁদের মধ্যে যে নেতিবাচক পূর্ব–ধারণা ছিল তা থেকে তাঁরা নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবে। ইনশাআল্লাহ , একবিংশ শতাব্দীই হলো সেই সময় যখন মানুষ সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারবে যে ইসলামী মুল্যবোধের প্রসারই হলো এই পৃথিবীতে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শান্তি অর্জনের একমাত্র উপায়।

টীকা :

1. Prof. Thomas Arnold, The Spread of Islam in the World, A History of Peaceful Preaching, Goodword Books, 2001, p. 79-80
2. John L. Esposito, Islam: The Straight Path, Oxford University Press, 1998, p. 10
3. Ahmad Diya'al-Din al-Kamushkhanawi, Ramuz al-Ahadith, Vol 1, 84/8
4. Ahmad Diya'al-Din al-Kamushkhanawi, Ramuz al-Ahadith, Vol 1, 76/12
5. Bukhari (5778) and Muslim (109 and 110), Reported by Muslim - Eng. Trans, Vol. 1, p.62, No. 203
6. Karen Armstrong, Holy War, MacMillan London Limited, 1988, p. 25
7. Tabari, Ta' rikh, 1, 1850, cited in Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, Johns Hopkins Press, Baltimore, 1955, p. 102
8. W.H.C. Frend, “Christianity in the Middle East: Survey Down to A.D. 1800”, Religion in the Middle East, Ed. A.J. Arberry, I-II Cambridge, 1969, Volume I, p. 289
9. Prof. Thomas Arnold, The Spread of Islam in the World, A History of Peaceful Preaching, p. 71-72
10. L. Browne, The Prospects of Islam, p. 11-15
11. John L. Esposito, Islam: The Straight Path, p. 33-34

12. Bernard Lewis, The Middle East, Weidenfeld & Nicolson, London, 1995, p. 210
13. Prof. Thomas Arnold, The Spread of Islam in the World, A History of Peaceful Preaching, p. 96
14. Prof. Thomas Arnold, The Spread of Islam in the World, A History of Peaceful Preaching, p. 88-89
15. André Miquel, L'Islam et sa Civilisation VIIème - XXème Siècle, Librarie Armand Colin, Paris 1968, p. 244.
16. Gesta Francorum, or the Deeds of the Franks and the Other Pilgrims to Jerusalem, translated by Rosalind Hill, London, 1962, p. 91
17. August C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eye-Witnesses and Participants, Princeton & London, 1921, p. 261
18. August C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eye-Witnesses and Participants, p. 262
19. Alan Ereira, David Wallace, Crusades: Terry Jones Tells the Dramatic Story of Battle for Holy Land, BBC World Wide Ltd., 1995.
20. The Pact of Najran, Article 6, http://www.islamicresources.com/Pact_of_Najran.htm
21. Karen Armstrong, Holy War, p. 30-31
22. John L. Esposito, Islam: The Straight Path, p. 58
23. Prof. Thomas Arnold, The Spread of Islam in the World, A History of Peaceful Preaching, p. 56
24. John L. Esposito, Islam: The Straight Path, p. 59
25. Karen Armstrong, Holy War, p. 185
26. Francis E. Peters, Jerusalem: Holy City in the Eyes of Chroniclers, Visitors, Pilgrims, and Prophets from the Days of Abraham to the Beginnings of Modern Times, Princeton, Princeton University Press, 1985, p. 363
27. An Interview with Edward Said by the Israeli Newspaper Haaretz, Friday, August 18, 2000
28. Charles Darwin, The Descent of Man, 2nd edition, New York, A L. Burt Co., 1874, p. 178
29. Lalita Prasad Vidyarthi, Racism, Science and Pseudo-Science, Unesco, France, Vendôme, 1983. p. 54
30. Theodore D. Hall, “The Scientific Background of the Nazi "Race Purification” Program”, http://www.trufax.org/avoid/nazi.html
31. James Joll, Europe Since 1870: An International History, Penguin Books, Middlesex, 1990, p. 164
32. M.F. Ashley-Montagu, Man in Process, New York: World. Pub. Co. 1961, pp. 76, 77 cited in Bolton Davidheiser, W E Lammers (ed) Scientific Studies in Special Creationism, 1971, p. 338-339

33. L.H. Gann, "Adolf Hitler, The Complete Totalitarian", The Intercollegiate Review, Fall 1985, p. 24; cited in Henry M. Morris, The Long war Against God, Baker Book House, 1989, p. 78
34. J. Tenenbaum., Race and Reich, Twayne Pub., New York, p. 211, 1956; cited by Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", http://www.trueorigin. org/ holocaust.htm
35. Peter Chrisp, The Rise Of Fascism, Witness History Series, p. 6
36. Hickman, R., Biocreation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51–52, 1983; Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101–111, 1999
37. Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History, Historical Studies on Science and Belief, 1980
38. Alan Woods and Ted Grant, Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London: 1993
39. K. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977
40. Karl Marx, Das Capital, Vol. I, 1955, p. 603
41. Vladimir Ilich Lenin, Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 11, p. 216
42. L. Poliakov, Le Mythe Aryen, Editions Complexe, Calmann-Lévy, Bruxelles, 1987, p. 343
43. Robert Clark, Darwin: Before and After, Grand Rapids International Press, Grand Rapids, MI, 1958., s. 115-116; cited by Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", http://www.trueorigin.org/ holocaust.htm
44. Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977. p. 2
45. Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), p.196
46. "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the American Meteorological Society, vol 63, November 1982, p. 1328-1330.
47. Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, p. 7
48. Jeffrey Bada, Earth, February 1998, v. 40
49. Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth", Scientific American, vol 271, October 1994, p. 78
50. Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 189
51. Charles Darwin, The Origin of Species, p. 184.

52. B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.
53. Charles Darwin, The Origin of Species, p. 179
54. Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, vol 87, 1976, p. 133
55. Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. p. 197
56. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, ss. 75-94; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, vol 258, p. 389
57. J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, December 1992
58. Alan Walker, Science, vol. 207, 1980, p. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1st ed., New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, p. 272
59. Time, November 1996
60. S. J. Gould, Natural History, vol. 85, 1976, p. 30
61. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, p. 19
Richard Lewontin, "Billions and billions of demons", The New York Review of Books, 9 January, 1997, p. 28.